لا إله إلا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ৭ম সংখ্যা

১৭ই রবিউস সানী, ১৪১৩ হিঃ ।। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৯ বাংলা ।। ১৫ই অক্টোবর ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৭ম সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমু'আর খুতবা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী ১০

কুরআনের দৃষ্টিতে দেশ ভ্রমণ
জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২৬

'খতমে নবুওয়াত' প্রসঙ্গে
মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩০

ছোটদের পাতা
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৩৪

সংবাদ ৪০

সম্পাদকীয় ৪৩

যামানার ইমাম (আঃ) বলেন :

"আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁহার আশ্চর্য লীলা দর্শন করিতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে এবং তাঁহার আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করে না বস্তুত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি। যে আজও জানে না যে, তাহার এইরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(রূহানী খাযায়েন : ১৯ খণ্ড, ২০ পৃঃ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ৭ম সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর, ১৯৯২ইং : ১৫ই ইখা, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ৩০শে আশ্বিন, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৪২। এবং তালাকপ্রাপ্তা নারীদিগকে ন্যায়সংগতভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী (২৯৯) দান করিতে হইবে—ইহা মুত্তাকীগণের উপর বাধ্যকর।

২৪৩। এইভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর। ৩১ রুকূ

২৪৪। তোমার নিকট কি তাহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই যাহারা সংখ্যায় হাজার হাজার (৩০০) হইয়াও মৃত্যু (৩০১) ভয়ে নিজেদের গৃহ হইতে বাহির (৩০২) হইয়াছিল? ইহাতে আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বলিলেন, 'মর (৩০৩) তোমরা'; অতঃপর, তিনি তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৯৯। পূর্ববর্তী আয়াতে বিধবার প্রতি যেরূপ অতিরিক্ত সুবিধা দানের কথা বলা হইয়াছে, তেমনি বর্তমান আয়াতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত সুবিধা দান ও দয়া প্রদর্শনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়, কেননা বিবাহ বিচ্ছেদকালে স্বাভাবিকভাবে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাহা মানুষকে বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর প্রতি অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের দিকে প্ররোচিত করে।

৩০০। ফেরাউনের অত্যাচারের দরুন ইসরাঈলীরা যখন মিশর পরিত্যাগ করিয়া এশিয়ায় উপনীত হইল, তখন মূসা (আঃ) তাহাদিগকে 'প্রতিশ্রুত ভূমিতে' প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে বলিলেন। কিন্তু সেই স্থানের অধিবাসীদের ভয়ে তাহারা আর অগ্রসর হইল না (৫:২৫)।

টীকা অপর পৃঃ দ্রঃ

২৪৫। এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যুদ্ধ কর (৩০৪) এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২৪৬। কে এমন আছে যে আল্লাহ্‌কে (নিজ ধন-সম্পদ হইতে) উত্তম ঋণ (৩০৫) দিবে যেন তিনি উহাকে তাহার জন্য বহু গুণে বাড়াইয়া দেন? আর আল্লাহ্‌ (ধন-সম্পদ) গ্রহণ করেন এবং বাড়াইয়া থাকেন; এবং তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

৩০১। মিশর ত্যাগকারী ইসরাঈলীদের সংখ্যা বাইবেলে ৬ লক্ষ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাহারা কয়েক সহস্র ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে প্রাপ্ত সংখ্যা কুরআনের অভিমতকেই সত্য সাব্যস্ত করে (হিষ্ট্রি ওব দি পিপলস অব ইসরাঈল: প্রণেতা আরনেষ্ট রেনান, পৃষ্ঠা ১৪৫, ১৮৮৮ এবং হিষ্ট্রি অব প্যালেষ্টাইন এণ্ড দি জিউস, ১ম খণ্ড, ১৭৫ পৃঃ, প্রণেতা জন কিট্রো, ২:৬১ও দেখুন)।

৩০২। বনী ইসরাঈল এই জন্য মিশর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, সেখানে আরও থাকার অর্থ হইত তাহাদের ভাবী প্রজন্মসহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্তি। কেননা ফেরাউন তাহাদের পুরুষগণকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার সকল উপায় ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছিল। ২:৫০ দেখুন।

৩০৩। হযরত মুসা (আঃ)-এর উপদেশ ও আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যাহারা 'প্রতিশ্রুত ভূমি'র দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না, তাহারা সিনাই-এর পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বনাঞ্চলেই বিনষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে নূতন বংশের উদ্ভব ঘটিলে তাহারা নব উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া যিহোশূয়ের নেতৃত্বে 'প্রতিশ্রুত ভূমি'তে প্রবেশ করে। অন্যত্র কুরআন বলে "অতঃপর আমরা তোমাদের মৃত্যুর পর, তোমাদিগকে উত্থিত করিলাম" (২:৫৭)

৩০৪। উপরে বনী ইসরাঈলীদের ভীতির দৃষ্টান্ত দিয়া, এই আয়াতে মুসমানদিগকে বলা হইয়াছে যে, যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে এবং জাতীয় সত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয় না, তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আত্মোৎসর্গকে জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি রূপে কুরআন চিহ্নিত করিয়াছে।

৩০৫। আল্লাহ্‌র রাস্তায় টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত খরচ করাকে, কুরআন আল্লাহ্‌কে ঋণদান রূপে বর্ণনা করিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ধর্ম কর্ম ও পুণ্য কাজে অর্থ ব্যয় করিলে, সেই অর্থ কখনও বিফলে যায় না।

হাদিস শরীফ

অঙ্গীকার পালন

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

والموفون بعهدهم إذا عاهدوا (البقرة : ١٧٨)

অর্থাৎ এবং (তাহারা) নিজেদের অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে যখন তাহারা কোন অঙ্গীকার করে। (বাকারা : ১৭৮)

হাদীস ঃ

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان -

(باب وفاء العهد هيثمى يجمع الزوائد)

অর্থাৎ ইবনে উমর বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অঙ্গীকার ভংগকারীদের জন্য কেয়ামতের দিন একটি ঝাণ্ডা গাড়া হবে, অতঃপর ঘোষণা করা হবে যে, ইহা অংগীকার ভংগকারীদের প্রতীক স্বরূপ যা (ভঙ্গ) করেছে ওমুকের পুত্র অমুক। (বাব ওফাউল আহদে হায়সমি মেজামত্তলযাওয়ায়েদে)

ব্যাখ্যা : হযরত রসূল করীম (সাঃ) মানব সভ্যতাকে সুখ ও শান্তিময় করার লক্ষ্যে যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা যদি আজ বর্তমান জগৎ মেনে নিত তা হলে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করত। কিন্তু পরিতাপ যে, ঐ জাতি যাদের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তারাই এই শিক্ষাকে ভুলে গেছে। অঙ্গীকার এমন একটি গুণ যা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে না। অঙ্গীকার ভঙ্গকারী জাতির শত্রু দুনিয়ার সবাই। যে জাতি বা যে ব্যক্তির মধ্যে অঙ্গীকার রক্ষার গুণ থাকে না তাদের মধ্যে সৎ সাহস থাকে না আর তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে।

খোদাতা'লা কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন, হাদীসে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) তারই একটি চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে কুরআন বলে যে, মুমেনের এক চিহ্ন হলো, সে যা অঙ্গীকার করে তা সে অবশ্যই পূর্ণ করে। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, মুমেনের অঙ্গীকার এত নিশ্চিত যে, যেন (সেই অঙ্গীকারটি) হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ পূর্ণ হয়েছে।

(অবশিষ্টাংশ ৯ম পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

'তাওয়াফ্‌ফি' (توفى) শব্দটি যখন হযরত ঈসা সম্পর্কে কুরআন শরীফে আসে তখন ইহার অর্থ সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়াই হয়, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে এই অর্থ হয় না— এই দাবীটি অদ্ভুত দাবী। সমগ্র বিশ্বের জন্য যেন 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের অর্থ রূহ কবজ করা, দেহ কবজ করা নয়; কিন্তু হযরত ঈসার জন্য বিশেষভাবে সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়াই অর্থ। এই যথেচ্ছ অর্থে আমাদের সৈয়্যদ ও মওলা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এই অর্থ হযরত ঈসার জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। এই কথার উপর জোর দেওয়া যে, এই ব্যাপারে ইজমা' (ঐক্যমত) হইয়া গিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন— ইহা অদ্ভুত মনগড়া কথা, যাহা বোধগম্য নহে। যদি ঐক্যমত দ্বারা সাহাবাগণের ঐক্যমত বুঝায় তবে ইহা তাঁহাদের উপর অপবাদ আরোপ করা হইবে। এই অভিনব বিশ্বাস সম্পর্কে তাঁহারা অবহিতই ছিলেন না যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসিয়া পড়িবেন। যদি তাঁহাদের এই বিশ্বাসই থাকিত তবে তাঁহারা এই আয়াতের বিষয় বস্তুর উপর কাঁদিয়া কাঁদিয়া কেন ঐক্যমতে পৌঁছিলেন যে, ما محمد الا رسول ج قد خلت من قبله الرسل অর্থাৎ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কেবল একজন মানুষ রসূল ছিলেন, খোদাতো ছিলেন না এবং তাঁহার পূর্বের সকল রসূল পৃথিবী হইতে গত হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং যদি হযরত ঈসা (আঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবী হইতে গত না হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাকে ঐ সময় পর্যন্ত মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা স্পর্শ করিয়া না থাকিত, তবে এই আয়াত শুনার পর কিভাবে সাহাবাগণ (রাঃ) এই বিশ্বাস পরিহার করিলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন না? প্রত্যেকে অবগত আছেন যে, এই আয়াত হযরত আবু-বকর (রাঃ) ঐ দিন সকল সাহাবীকে মসজিদুন নববীতে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, যেদিন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ঐ দিন ছিল সোমবার। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তখনো দাফন করা হয় নাই এবং আয়েশা

সিদ্দীকার গৃহে তাঁহার (সাঃ) পবিত্র মৃত্যু দেহ শায়িত ছিল। এই সময় কঠোর বিচ্ছেদ বেদনার দরুন কোন কোন সাহাবীর হৃদয়ে এই কুধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে ইন্তেকাল করেন নাই, বরং তিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এই বিভেদকে বিপজ্জনক মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সকল সাহাবাকে একত্রিত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ঐ দিন সকল সাহাবা (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। তখন হযরত আবুবকর মিম্বরে উঠিয়া বলিলেন, আমি শুনিয়াছি যে, আমাদের কোন কোন বন্ধু এই ধরণের ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য ইহা কোন বিশেষ ঘটনা নহে। ইহার পূর্বে এমন কোন নবী গত হন নাই, যিনি ইন্তেকাল করেন নাই। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) এই আয়াত পাঠ করেন, وما محمد الا رسول ج قد خلت من قبله الرسل অর্থাৎ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কেবল মানুষ রসূল ছিলেন। তিনিতো খোদা ছিলেন না।* অতএব ইহার পূর্বে যেরূপে সকল রসূল ইন্তেকাল করিয়াছেন, সেরূপে তিনিও ইন্তেকাল করিয়াছেন।

তখন এই আয়াত শুনিয়া সকল সাহাবার চক্ষু অশ্রু সজল হইয়া পড়িল এবং সকলে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন" পড়েন। এই আয়াতে তাঁহাদের হৃদয়কে এইরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল, যেন আয়াতটি ঐ দিনই অবতীর্ণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহার পর হাসান বিন সাবেত আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জন্য এই শোক গাঁথা রচনা করেন:

كنت السواد لنا ظرى — فعمى عليك الناظر
ما شاء بعدك فليمت — فعليك كنت احاذر

অর্থাৎ তুমি ছিলে আমার চোখের মণি। আমিতো তোমার মৃত্যুর ভয়ই করিতাম। এই কবিতায় হাসান বিন সাবেত সকল নবীর মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যেমন বলেন, মূসা মারা গিয়াছেন বা ঈসা মারা গিয়াছেন—তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? আমাদের শোক তো এই প্রিয় নবীর জন্য, যিনি আজ আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন এবং আমাদের চোখের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় কোন কোন সাহাবা এই ভ্রান্ত ধারণারও বশবর্তী ছিলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) "কাদ খালাত মিন কাবলেহির রুসুলু" আয়াত পেশ করিয়া এই ভ্রান্তি দূর করিয়া ছিলেন এবং ইসলামে ইহা প্রথম সর্ববাদীসম্মত মত ছিল যে, সকল নবী মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

---

* টীকা: যে ব্যক্তি হযরত ঈসাকে "কাদ খালাত মিন কাবলেহির রুসুলু" আয়াতের বাহিরে রাখে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) মানুষ নহেন। তাছাড়া এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর এই আয়াতে যে দলিল পেশ করিয়াছেন তাহা সঠিক সাব্যস্ত হয় না। কেননা যেস্থলে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, সেস্থলে এই আয়াত দ্বারা সাহাবাগণ (রাঃ) কোন্ ধরণের সান্ত্বনা লাভ করিয়া ছিলেন?

মোট কথা, এই শোক গাঁথা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কোন কোন স্বল্প চিন্তাশীল সাহাবী যাহাদের বর্ণনার সত্যতা উত্তম ছিল না (যেমন আবু হোরায়রা), তাহারা নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ প্রতিশ্রুত ঈসার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ধারণা পোষণ করিতেন যে, হযরত ঈসাই (আঃ) আগমন করিবেন, যেমন প্রথমদিকে আবু হোরায়রাও এই ধোকাতেই পড়িয়াছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবু হোরায়রা নিজের সরলতা ও বর্ণনার দুর্বল সত্যতার দরুণ এইরূপ ধোকায় পড়িয়া যাইতেন। বস্তুতঃ একজন সাবাবীর আগুনে পড়িয়া যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণীতেও তিনি এই ধোকাতেই পড়িয়াছিলেন এবং

وان من اهل الكتب الا ليؤ منن به قبل موته

(সূরা আল্ নিসা—১৬০) (অর্থঃ আহলে কিতাব হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে।—অনুবাদক) আয়াতের উল্টা অর্থ করিতেন। ইহাতে শ্রোতাদের হাসির উদ্রেক করিত। কেননা তিনি এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। অন্যদিকে এই আয়াতের অন্য কেরাত قبل موته এর পরিবর্তে قبل موتهم মওজুদ আছে। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে কুরআন শরীফের বিরোধী যে, কোন যুগ এইরূপও আসিবে যখন সকল মানুষ হযরত ঈসা (আঃ)-কে গ্রহণ করিয়া লইবে। কেননা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين
اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة

(সূরা আলে-ইমরান: ৫৬)। অর্থাৎ হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব। অতঃপর মৃত্যুর পরে মোমেনদের ন্যায় নিজের দিকে তোমাকে উঠাইব। এবং সকল অপবাদ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব এবং কেয়ামত পর্যন্ত তোমার অনুসারীদিগকে তোমার বিরুদ্ধবাদীদের উপর জয়যুক্ত রাখিব। এখন ইহা পরিষ্কার যে, যদি কেয়ামতের পূর্বে সকল মানুষ হযরত ঈসার উপর ঈমান আনিয়া ফেলে তবে ঐ সকল বিরুদ্ধবাদী কাহারা যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা অন্য এক স্থানে বলেন,

والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة

(সূরা আল্-মায়েদা: ৬৫ আয়াত)। অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা থাকিবে। অতএব, ইহা পরিষ্কার যে, যদি সকল ইহুদী কেয়ামতের পূর্বেই হযরত ঈসার উপর ঈমান লইয়া আসে তবে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা পোষণকারী কাহারা থাকিবে?

এতদ্ব্যতীত সকল ইহুদী হযরত ঈসার উপর ঈমান লইয়া আসিবে—এই ধারণা এই দিক হইতেও অর্থহীন ও বিবেক বিরুদ্ধ যে, এই বিশ্বাস প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। কেননা হযরত ঈসার যুগ প্রায় দুই হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ইহা কোন গোপন

ব্যাপার নহে যে, এই সকলের মধ্যে কোটি কোটি ইহুদী, যাহারা হযরত ঈসাকে অস্বীকার করিত, তাঁহাকে গাল মন্দ করিত ও কাফের আখ্যা দিত, তাহারা পৃথিবী হইতে গত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে এই কথা কিভাবে সঠিক হইতে পারে যে, প্রত্যেক ইহুদীই তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিবে? একটু অনুমান করিয়া দেখতো এই দুই হাজার বৎসরে কত ইহুদী বেঈমানীর অবস্থায় মরিয়া গিয়াছে। ইহাদের জন্য কি রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলিতে পার ?

মোট কথা, সকল সাহাবার সর্ববাদীসম্মত মত, হযরত ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে ছিল; বরং সকল নবীর মৃত্যু সম্পর্কে ঐক্যমত হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাই প্রথম ইজমা' (সর্ববাদীসম্মত মত) সত্য ছিল, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হইয়াছে। এই ঐক্যমতের দরুনই সকল সাহাবা হযরত ঈসার মৃত্যুতে বিশ্বাসী ছিল। এই কারণেই হাসান বিন সাবেত উপরোল্লিখিত শোক গাঁথা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অনুবাদ আমি পূর্বেই করিয়াছি যে, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম! তুমি তো আমার চোখের মণি ছিলে। আমি তো তোমার মৃত্যুতে অন্ধ হইয়া গিয়াছি। এখন তোমার পরে যে কেহ চাহে মরুক—সে ঈসাই হউক বা মূসাই হউক। আমি তো তোমার মৃত্যুরই ভয় করিয়া ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সাহাবাগণ (রাঃ) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্যিকারের প্রেমিক ছিলেন। তাঁহাদের নিকট কোন মতেই ইহা গ্রহণযোগ্য ছিল না যে ঈসা, যাহার অস্তিত্বকে মহা শেরেকের মূল রূপে সাব্যস্ত করা হইয়াছে, তিনি জীবিত থাকিবেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করিবেন। অতএব যদি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের সময় তাঁহারা ইহা জানিতেন যে, হযরত ঈসা আকাশে সশরীরে জীবিত বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্মানিত নবী মারা গিয়াছেন তাহা হইলে তাহারা মনের দুঃখে মরিয়া যাইতেন। কেননা তাহারা কখনো ইহা সহ্য করিতেন না যে, অন্য কোন নবী জীবিত আছেন এবং তাঁহাদের প্রিয় নবী কবরে প্রবেশ করিবেন। اللهم صل على محمد وآله واصحابه اجمعين (অর্থঃ হে খোদা! তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বংশধর, এবং সকল সাহাবীর উপর শান্তি বর্ষিত কর—অনুবাদক)!

খোদাতা'লার এই কথা "بل رفعه الله اليه" (সূরা আল্-নিসা: ১৫৯; বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার দিকে উন্নীত করিয়াছেন—অনুবাদক) এর এই অর্থ করা যে, হযরত ঈসা সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহিয়ার পাশে গিয়া বসিয়াছেন, ইহা কতইনা অবিজ্ঞতা ও অজ্ঞতার কথা! মহিমান্বিত ও প্রতাপশালী খোদা কি দ্বিতীয় আকাশে বসিয়া রহিয়াছেন? কুরআনে رفع الى الله এর অর্থ অন্য কোন ক্ষেত্রে কি সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া করা হইয়াছে? সশরীরে আকাশের দিকে উঠাইয়া নেওয়ার কোন দৃষ্টান্ত কি কুরআন

শরীফে আছে? এই আয়াতের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য আয়াতও কুরআন শরীফে আছে। তাহা হইল:— يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (সূরা আল্ ফাজর: ২৮-২৯, অর্থ হে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, এমতাবস্থায় যে, তুমি (তাঁহার প্রতি) সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট—অনুবাদক)। সুতরাং ইহার অর্থ কি এই, "হে نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ (শান্তি প্রাপ্ত আত্মা)! সশরীরে দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যাও?" খোদাতা'লা কুরআন শরীফে বালাম বায়োর সম্পর্কে বলেন, আমি নিজের দিকে তাহার رَفْع (উন্নীতকরণ—অনুবাদক) চাহিয়াছি। কিন্তু সে যমীনের দিকে ঝুঁকিয়া গেল। এই আয়াতেরও কি এই অর্থই যে, খোদাতা'লা বালাম বায়োরকে সশরীরে আকাশে উঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বালাম যমীনে থাকাই পসন্দ করিল? আফসোস! কুরআন শরীফের কতখানি পরিবর্তন করা হইতেছে। এই সকল লোক ইহাও বলে যে, কুরআন শরীফে وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ لٰكِنْ شُبِّهَ (সূরা আল্ নিসা: ১৫৮, অর্থ: না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল—অনুবাদক) মকতুব আছে এবং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসাকে আকাশে উঠানো হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে, কোন ব্যক্তির নিহত না হওয়া বা ক্রুশবিদ্ধ হইয়া নিহত না হওয়া এই কথা প্রমাণ করে না যে, তাহাকে সশরীরে আকাশে উঠানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে সরাসরি وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ (সূরা আল্-নিসা: ১৫৮) শব্দগুলি রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহুদীরা হত্যা করার ক্ষেত্রে কৃতকার্য হয় নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সন্দেহের মধ্যে ফেলা হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য অন্য কোন মোমেনকে ক্রুশে হত্যা করিয়া অভিশপ্ত বানানোর কি প্রয়োজন ছিল?* অথবা ইহুদীদের মধ্য হইতেই কাহাকেও হযরত ঈসার আকৃতি বানাইয়া ক্রুশে চড়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কি। কেননা এমতাবস্থায় এইরূপ ব্যক্তি নিজেকে হযরত ঈসার শত্রুরূপে প্রকাশ করিয়া নিজ পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ঠিকানা ও চিহ্ন

---

*টীকা: ইহা অদ্ভুত ব্যাপার যে, ইসলামে স্বপ্নের তা'বিরের ইমামগণ যেখানে হযরত ঈসার দর্শনের তাবির (স্বপ্নের ব্যাখ্যা) করেন সেখানে এই কথা লেখেন যে, ব্যক্তি হযরত ঈসাকে স্বপ্নে দেখে সে কোন বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অন্য কোন দেশের দিকে চলিয়া যাইবে এবং এক ভূমি হইতে অন্য ভূমির দিকে হিজরত করিবে। তাহারা ইহা দেখেন না যে, সে আকাশে উঠিয়া যাইবে। তা'তিরুল আনাম গ্রন্থ এবং অন্যান্য ইমামগণের গ্রন্থাবলী দেখ। অতএব বুদ্ধিমানদের নিকট সত্য প্রকাশের জন্য ইহাও একটি দিক নির্দেশনা।

প্রদান করিয়া এক মুহূর্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিত এবং বলিতে পারিত যে, ঈসা যাদুর দ্বারা আমাকে তাহার আকৃতি দিয়াছে। ইহা কিরূপ পাগলামীপূর্ণ কুবিশ্বাস! কেননা ولكن شبه لهم এর অর্থ ইহা করা হয় না যে, ঈসা ক্রুশে মারা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার উপর বেহুশ অবস্থা বিরাজ করিয়াছিল। অতঃপর দুই তিন দিনের মধ্যে তিনি জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন এবং ঈসায়ী মলম ব্যবহারের দরুন (ইহা অদ্যবধি শত শত চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই মলম হযরত ঈসার জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল) তাঁহার যখম ভাল হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

(৩য় পাতার পর)

আজ মুসলমানদের মধ্যে চরম অশান্তি বিরাজ করছে। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর দিকে তাকান। এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর অশান্তি আর অরাজকতার পিছনে একটি কারণ হলো অঙ্গীকার ভংগ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধঃপতনের একটি মূল কারণ ইহাও। আর নৈতিক ক্ষেত্রেও ইহাকে মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং মুমেনের যে চিহ্ন কুরআন বলেছে তা যেন আমাদের আর্থিক লেনদেন ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করি। সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার হলো—আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। আসুন এই অঙ্গীকার অনুযায়ী আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের ভালোবাসাকে আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করি। আমীন

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম

"সেই সর্বোচ্চ স্তরের জ্যোতিঃ যাহা মানবকে অর্থাৎ পূর্ণ মানবকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, নক্ষত্ররাজিতে ছিল না, চন্দ্রে ছিল না, সূর্যে ছিল না, তাহা পৃথিবীর সমুদ্র এবং নদীসমূহে ছিল না, তাহা মুক্তা, মাণিক্য, পান্না, মতিতেও ছিল না। বস্তুতঃ তাহা পৃথিবী ও আকাশের কোন বস্তুতেই ছিল না, কেবল মাত্র মানবের মধ্যে ছিল অর্থাৎ পূর্ণ মানবের মধ্যে। তিনি হইলেন শ্রেষ্ঠতম ও পূর্ণতম, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম অস্তিত্ব আমাদের নেতা ও প্রভু নবীগণের নেতা, অমর জীবনপ্রাপ্তগণের নেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। অতএব এই জ্যোতিঃ পূর্ণ মানবকে দান করা হইয়াছে, এবং মর্যাদানুসারে তাহাদিগকেও কিছু দান করা হইয়াছে যাহারা তাঁহারই মতন কিছু গুণ রাখিত—এই মর্যাদা, উচ্চতা ও পূর্ণতাসহ এবং পূর্ণাঙ্গীনভাবে কেবলমাত্র আমাদের নেতা ও প্রভু, আমাদের হাদী, উম্মী 'সাদেক" ও 'মাসদূক" মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মধ্যেই পুঞ্জীভূত।"

(রূহানী খাযায়েন-পঞ্চম খণ্ড, ১৬০ পৃঃ)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

[১০ই এপ্রিল, ১৯৯২ইং মোতাবেক ১০ই শাহাদাত ১৩৭১ হিঃ শামসী তারিখে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

ঈদের খুৎবাতে আমি আমার স্ত্রীর মৃত্যুর উদ্ধৃতি দিয়ে জামা'তের পুরুষদিগকে বেদনা-পূর্ণ ও জোরদার উপদেশ প্রদান করেছিলাম যে, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের সংগে সদ্ব্যবহার করে। এ উপদেশ স্বামীদের পরিবারবর্গদিগকে, তাদের মাদিগকে, তাদের বোন ইত্যাদিগণকেও শামিল করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, কোন কোন সময়ে অসহায় ও দুর্বল মহিলারা তাদের শ্বশুরালয়ের তরফ থেকে নানা নির্যাতনের লক্ষ্য স্থল হয়ে যায়, কিন্তু তারা কিছুই করতে পারে না। তাদের উপর নির্যাতনের এ অবস্থা প্রকারান্তরে মর্মান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যা যেকোন মুহূর্তে নির্যাতনকারীকে নিশ্চিতভাবে আঘাতে ঠেলে দিতে পারে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম ঐ সকল দোয়া প্রসঙ্গে যা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে গৃহীত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত, নির্যাতিত ব্যক্তির দোয়াকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছেন যে, এ দোয়া এমন যা রদ করা যায় না। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি যে উপদেশ দিয়েছিলাম, তা পুরুষদের বা তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধে ছিল না; কোন রাগ বা বিদ্বেষের ফলশ্রুতি স্বরূপ ছিল না; না ইহার সময় ছিল না ইহার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে, বরং সহানুভূতি স্বরূপ আমি এরূপ বলেছিলাম। কিন্তু ঈদ উপলক্ষ্যে সাক্ষাতের সময় এমন একজন বন্ধুর সংগে দেখা হল যিনি ইহাতে অনেক বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে অভিযোগ করে বললেন যে, আপনি কখনো কখনো কেবল একদিকেরই কথা বলতে থাকেন, অন্যদিকের খেয়াল রাখেন না। মহিলারা কি যালেম হতে পারে না? মহিলারাও বড় বড় যালেম হয়। তখন আমি তাকে বুঝালাম যে, এখনই আমি মহিলাদের নিকট হতে এসেছি, হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উচ্চারণে তাদিগকেও উপদেশ দিয়ে এসেছি, তারা যেন তাদের দায়-দায়িত্ব পালন করে যান। কিন্তু সে বিষয়টি এমনই ছিল যে, উহা দ্বারা আমি সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা করলাম। যদি একটি দুঃখের বিনিময়ে অনেকগুলো সুখ অর্জিত হয় তা হলে এটা লাভবান সওদা, এতে অভিযোগ করা বা অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। আসলে তো ভালোভাবেই আমার জানা আছে যে, মহিলাদের মধ্যেও অনেক যালেম আছে। তাদের মধ্যেও এমন আছে যাদের দরুন ঘর

বিরাম ও বিনাশ হয়ে যায়। এমন মহিলাও আছে যাদের প্রকৃতিতে উশৃঙ্খলতা দেখা যায় এবং نشوز (নশূয) বা পরম অবাধ্যতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ প্রকারের মহিলারাই অপরাপর মহিলাদের উপর যুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; এরূপ যালেম মায়ের কোলেই পুত্ররা লালিত পালিত হয়ে যালেম পুরুষের অগ্নি রূপ ধারণ করে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে আর একটি গুণ পরিলক্ষিত হয় যে, তারা কন্যাগণ অপেক্ষা পুত্রগণকে বেশী আদর ও সম্মানের পাত্র মনে করে এবং পুত্রগণকে মা'বূদরূপে উর্ধ্ব স্থান দান করে। বোনদের মোকাবেলায় ভাইদের বৈধ অবৈধ সকল আবদার রক্ষা করা হয়। তাদের আপন বোনদিগকেও ঘরে ভাইদের সামনে দাসী তুল্য গণ্য করা হয়। এমন কি ভাইদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও তারা করতে পারে না। এমনও ঘর আছে যেখানে মহিলারা পুরুষদিগকে কার্যতঃ পূজা করে থাকে। তাছাড়া আরো বহু সামাজিক খারাপি আছে যেগুলিকে বস্তুতঃ মহিলারাই জন্ম দিয়ে থাকে। এবং সন্তান-সন্ততির মধ্যে সেগুলি লালিত পালিত হতে থাকে। সন্তানরা বড় হলে সেইসব খারাপিও ভীষণরূপ ধারণ করে এবং সমাজ ভয়াবহ রূপে নোংরা ও কলুষপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সেই বন্ধু চিন্তা করে নি যে, এসব সত্ত্বেও সেই সময়টি এরূপ উপদেশ দেওয়ার সময় ছিল না।

একটি মহিলার মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে যদি মহিলাদিগকে উপদেশ দান করা হতো যে, তোমরা যুলুম করো না তাহলে এটা হতো পরম অশালীন ও বৃথা এবং রুচি বহির্ভূত বিষয়। তখন এর মর্ম এরূপ দাঁড়াতো যেন প্রকারান্তরে দুনিয়াবাসীর নিকট এ ঘোষণা দেয়া হচ্ছে যে, আমি আমার স্ত্রী দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগ জানাচ্ছি। যদিও প্রত্যক্ষভাবে তাকে কিছু নাও বলি তথাপি উপদেশের বাহানা করে আমি তাকে তর্জন গর্জন করছি যে, তুমি আমাকে অনেক জ্বালাতন নির্যাতন করে গেছ।

অতএব স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কথা বলা উচিত। এর মর্ম এ নয় যে, আমি অপর দিকের দুর্বলতা সম্বন্ধে অনবহিত। এ স্থলে এদিকটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু আরো কথা রয়েছে যা আমি আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরতে চাই।

যুলুমের ও অনেক প্রকার ভেদ আছে

বস্তুতঃ ইহা মানুষের অনুভূতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলি মানুষ নিজ মেজাজ অনুযায়ী করে থাকে এবং সেগুলোকে সে যুলুমের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে মানুষ সাধারণতঃ নীতি বিরুদ্ধ মনে করে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বা উচ্চাভিলাষী নীতিবান লোকের দৃষ্টিতে সেগুলি নীতি বিরুদ্ধ বলে গণ্য হয়। অতএব মানুষের অনুভূতির তারতম্য ভিন্ন ভিন্ন, সেই অনুযায়ী মানুষ জিনিস মাপজোখ করে থাকে এবং সেই মাপজোখে নব নব চিত্র পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ব্যবহারিক পদ্ধতি যা মানুষ অন্যের উপর প্রয়োগ করে থাকে উহা দেখার জন্যও বিভিন্ন

পরিমাপ যন্ত্র রয়েছে যা দৃষ্টির সূক্ষ্মদর্শিতার প্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে থাকে। হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টির সূক্ষ্মদর্শিতা এমন ছিল এবং তাঁর নৈতিক মর্যাদা ও স্থান এত উচ্চ ছিল যে, যেসকল বিষয়কে তিনি নিজের মাপকাঠিতে দুর্বল মনে করতেন এবং যার জন্য বেশী বেশী এস্তেগফার পড়তেন সেগুলো একজন ওলী-উল্লাহর মাপ কাঠিতে পুণ্য বলে গণ্য হতো যাতে তারা এরূপ কল্পনাও করতো না যে, এগুলোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও এস্তেগফার পড়ার প্রয়োজন রয়েছে।

অতএব আমার উদ্দেশ্য এই ছিল এবং আছে যে, জামা'তের চারিত্রিক মান উচ্চ করি এবং তাদের মেজাযে ও প্রকৃতিতে সূক্ষ্মদর্শিতা এবং কোমলতা সৃষ্টির চেষ্টা করি ; যার ফলে তারা নিজেদের কার্যকল্যাপের জন্য উত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী হতে পারেন। যদি রুচির মান উচ্চ না করা হয় তা হলে চরিত্রের মানও উচ্চ হতে পারে না। মানুষ অনেক সময় আত্ম তিমিরে নিমজ্জিত থাকে। সূফিগণের ভাষায় পর্দা উঠার যে প্রবাদ শুনা যায় ইহা একটি সত্য কথা। ইহা তাঁদের কেবল কাল্পনিক কোন নাযুক ধারণা নয় বরং অনেক গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কোন সূফি রূপকভাবে কথাটি পেশ করেছেন যে, মানুষ যবনিকার অন্তরালে বাস করে, যখন যবনিকা অপসারিত হয় তখন সে আরিফবিল্লাহ (আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় লাভকারী) হতে আরম্ভ করে। অতএব প্রথমে নিজেদের অন্তর হতে যবনিকা অপসারিত করে নিজেদের অস্তিত্বকে যাচাই করতে আরম্ভ করুন তখন আপনারা জগদ্বাসীর সংগে সদাচরণ করার যোগ্যতার অধিকারী হবেন। যারা যবনিকার অন্তরালে বাস করে তারা সদা নিজদিগকে নির্যাতিত মনে করে। যেমন কোন কোন সময় আমি এমন স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া শুনেছি যারা দুর্ভাগ্যবশঃত উভয়েই যবনিকার অন্তরালে বাস করতেন। সারা জীবন স্বামী নিজেকে নির্যাতিত মনে করে এসেছে এবং স্ত্রীও সারা জীবন নিজেকে নির্যাতিত মনে করে এসেছে এবং কেহই এ চেষ্টা করে নি যে, নিজ অস্তিত্বের উর্ধ্বে গিয়ে মানুষ নিজ প্রাণের উপর অন্ধকারের যে সব পর্দা পেঁচাতে থাকে এবং অবশেষে সে উহাতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, সেইসব পর্দা হতে বাহিরে এসে তারা আসল তত্ত্বাদি উপলব্ধি করতে পারে। এর কতকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। সেই অস্তিত্বকে যা মানুষের জন্য রাশি রাশি অন্ধকার সৃষ্টি করে, অন্য এক দৃষ্টি কোণে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সেই অস্তিত্বই অন্ধকার রাশিকে দূরীভূত করার কারণ হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের চরম শক্তিই হচ্ছে তার আমিত্ব।

আত্মম্ভরিতাই কখনো নেতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি করে আবার কখনো ইতিবাচক অবস্থা সৃষ্টি করে, যথা এমন স্বামীরা যাদের কথা আমি উল্লেখ করেছি, যাদের সাথে তাদের মা বোন ও অন্যান্য প্রিয়জন একত্রে থাকে তারা তাদের ঘরে আগত একজন নিঃসঙ্গ ও নিরুপায় মহিলাকে ভৎর্সনার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ফেলে। তার সঙ্গে নানাভাবে অসদাচরণ দেখাতে আরম্ভ করে ; যার ফলে মহিলাটি বেগতিক ও অপারগ হয়ে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে। তারা কখনো কল্পনাও করে না যে, তারা তার উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে কারণ তারা

কেবল তার দুর্বলতাই খুঁজতে থাকে। এবং ঐ সব দুর্বলতাকে তারা কাল্পনিকভাবে অতি-রঞ্জিত করতে থাকে। সাধারণ দোষত্রুটিও তখন তাদের দৃষ্টিতে বড় দোষত্রুটি রূপে পরিলক্ষিত হয়; উহার ফলে যখন তারা তার উপর নির্যাতন এবং কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করে তখন তারা বুঝতেও পারে না যে, তার কত কষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি বুঝার জন্য তারা নিজেদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলেও সচেতন হতে পারে। তাদের বোন রয়েছে মা রয়েছে তাদের আরো স্বজন প্রিয়জন রয়েছে যাদের সঙ্গে তাদের প্রগাঢ় সম্পর্ক আছে তারা যদি একটু চিন্তা করে যে তাদের স্বজন প্রিয়জনের সংগে, যারা অন্যের রহম ও কৃপার উপর জীবিত আছে এরূপ ব্যবহার করা হয় তখন তাদের কি অবস্থা হবে? সে অবস্থায় তাদের মান সম্মান ও আত্মমর্যাদার রগ চটে উঠে এবং তারা জীবন দেয়া এবং জীবন নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারা অন্যের সম্মান নিয়ে খেলা করে। তারা যদি নিজেদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে আরো চিন্তা করে তাহলে তারা অবশ্যই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবে যে, তারা কত ধৃষ্টতার সহিত এমন কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত যে, যদি তাদের সংগে এরূপ ব্যবহার করা হয় তখন তারা নিজেদের প্রাণ দেয়ার এবং অন্যের প্রাণ নেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মোটকথা নিজ সত্তার বিষয়টি দুইভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ এভাবে যে যালিম ব্যক্তি নিজের অভ্যন্তর সম্বন্ধে অনবহিত হয়ে অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করতে থাকে এবং অন্যের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ নিজ সত্তাকে মানুষ যালিম মনে করলে অথবা ঐ সকল লোকের বিরুদ্ধে যুলুমের কল্পনা করলে যারা তার প্রিয়জন অতঃপর লক্ষ্য করলে যে, কি হওয়া উচিত ছিল এবং কি হচ্ছে না; এইরূপে মানুষের চক্ষু খুলে যেতে পারে এবং সে উহা লক্ষ্য করতে পারে যা সে পূর্বে লক্ষ্য করছিল না।

আসলে জীবনের যাত্রাপথে যে বিষয়টি সর্বাধিক সূক্ষ্মদর্শিতা সৃষ্টি করে উহা হল তাক্‌ওয়া। মানুষ যদি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁর ভালবাসা লাভ করার জন্য তাঁর দিকে যাত্রা শুরু করে তখন সেই যাত্রায় শিষ্টাচার ও আদব কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখার নামই হচ্ছে তাক্‌ওয়া। এর মর্ম এই যে, মানুষ তার প্রিয়পাত্রের অন্তর জয় করতে চায় এবং সদা ইহার প্রতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে যেন আমার দ্বারা এমন কোন ঘটনা না ঘটে যার ফলে প্রিয়পাত্র অসন্তুষ্ট হয়ে যায় যা তার খারাপ লাগতে পারে, এ ভয়ই হচ্ছে আসলে তাক্‌ওয়া। তাক্‌ওয়ার মর্ম আসলে কোন বিশেষ বস্তু থেকে রক্ষা পাওয়া। সাধারণ ব্যবহারে ইহার অনুবাদ করা খোদার ভয়। ভয় কোন্ অর্থে? এ ব্যাপারে আমি পূর্বেও আলোকপাত করেছি। আজকে আমি এ বিষয়টি বুঝাতে চাই, সম্ভবতঃ পূর্বেও বলেছি কিন্তু পুনরায় আমি এই বিষয়ের উপর জোর দিয়ে বলতে চাই, তাক্‌ওয়া দ্বারা এমন ভয় বুঝায় যে, আমাকে সেই সব বিষয় হতে বেঁচে চলতে হবে যেসব বিষয়ের দরুন আমাকে আমার প্রিয় পাত্রের অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে এবং আমার প্রতি তিনি রাগ করতে

পারেন। ইহা নেতিবাচক শক্তি হলেও ইতিবাচক ফল সৃষ্টি করে। তাকওয়া বাহ্যতঃ নেতিবাচক শক্তি ও আত্মরক্ষার গুণ বিশেষ। আত্মরক্ষার দ্বারা ইহা বুঝায়, যেমন আপনি সফরে রওনা হলেন, তখন আছাড় ও পদস্খলন হতে আত্মরক্ষা করা, চোর ডাকাতের হাত হতে আত্মরক্ষা করা, আরো নানা দুর্ঘটনা ও অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা করা, এসব আত্ম-রক্ষা তাকওয়ার অর্থেরই অন্তর্গত যার মধ্যে নেতিবাচক অর্থ রয়েছে, কিন্তু উহার যে ইতিবাচক ফল প্রকাশ পায় তা হলো জীবন, সম্পদ, মান-সম্মান ও আনন্দ ও খুশীর রক্ষণাবেক্ষণ। তাই তো কুরআন করীমে বিশেষ করে আনন্দ উৎসবে ইহার উল্লেখ এসেছে ; শাদি-বিবাহের উৎসবকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করতেন এগুলির মধ্যে পাঁচবার তাকওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে। আনন্দ উৎসব আর ভয়ের কথাবার্তা। এর মর্ম এই যে, এরূপ ভয় তোমাদের আনন্দের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং তোমা-দিগকে অনেক রকমের দুঃখ-কষ্ট হতে আশ্রয় দিবে। চলতে চলতে আপনি আছাড় খেতে পারেন। খোদা না করুন পড়েও যেতে পারেন এবং আপনার হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে। কোন কোন সময় এমন ক্ষতিও হতে পারেন যে, যাবজ্জীবনের জন্য আপনি অচল হয়ে যেতে পারেন। একটু ছোটখাট গাফিলতির ফলে সারা জীবনের জন্যে কষ্টে পড়ে যেতে পারেন। তাকওয়ার সফরও আসলে এ প্রকারেরই সফর। ইহাকে ছোট ও সাধারণ জিনিষ ভাবা উচিত নয়। তাকওয়ার শূন্যতার ফলে কোন কোন সময় মানুষের এমন পদস্খলন ঘটে যা চিরকালের জন্য তার দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে যায়।

সুতরাং এক্ষেত্রে আমি পুরুষগণকেও এবং মহিলাগণকেও খোদার তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিতেছি। পুরুষদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ইহার পুনরাবৃত্তি এজন্য করছি যে, পুরুষ যদি নির্যাতিত হয়ে থাকে তাহলে তুলনামূলকভাবে তাদের জন্য মুক্তি পাওয়ার পথ সহজ এবং ব্যাপক। পুরুষ বহির্জগতে স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা করে, তাছাড়া পুরুষ সাধারণতঃ শক্তিশালী হয়, এজন্য তার উপর শারীরিক চাপ সৃষ্টি ও জোরজবরদস্তি করা যায় না। পুরুষের আয়ত্বে রয়েছে যখন ইচ্ছা বাড়ীঘর ছেড়ে বাইরে চলে যেতে পারে। রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে চাইলে সে দুই দুই তিন তিন রাত্রে বাড়ী নাও ফিরতে পারে। পুরুষের উপর নারীরা সাধারণতঃ হাত উঠায় না, যদি উঠায়ও তাহলে তাকে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। মোট কথা, পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিশেষভাবে পুরুষদিগকে উপদেশ দিব কারণ তারা কতগুলি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যেমন কুরআন করীমেও ইরশাদ রয়েছে ; الرجال قوامون على النساء পুরুষরা নারীদের চাইতে অধিক শক্তিশালী এবং ইহার উপযুক্ত যে, তারা তাদিগকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করেন। অতএব এইদিক দিয়ে প্রত্যেক পুরুষকে সদা নিজেদের পর্যবেক্ষণ করতে দেখা উচিত যে, আমি আমার শক্তি ও প্রাধান্যের অপব্যবহার তো করছি

না। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা উচিত যে, আমার উপদেশের এ মর্ম আদৌ নয় যে, আল্লাহ্-তা'লা পুরুষকে প্রাধান্যের যে গুণ দান করেছেন উহা দয়ার্দ্র চিত্তের নামে বিসর্জন দেয়া উচিত নয়। আমি এ কথাটি বুঝিয়ে দেয়াও জরুরী মনে করি যে স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ, নম্র ব্যবহার উত্তম চরিত্র প্রদর্শন, তাদের যুলুম অত্যাচারকে সাহস ও সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করণ তাদের প্রতি ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন এবং দয়া ও মমতার ব্যবহার করণ এসব বিষয়ই উত্তম গুণবিশেষ এবং পুরুষদের জন্য অলঙ্কার ও ভূষণ স্বরূপ; যেগুলি তাকে খোদার দৃষ্টিতে আরো সুন্দর ও সুশোভিত করে তুলে। নম্রতার নামে এবং প্রীতি ও স্নেহ-মমতার নামে নিয়মের সঙদা করা এবং খোদা প্রদত্ত প্রাধান্য ও অভিভাবকত্বকে বিসর্জন দেয়া উত্তম চরিত্রের অন্তর্গত নহে বরং দুশ্চরিত্রের অন্তর্গত। খোদাতা'লার দৃষ্টিতেও এরূপ আচরণ গ্রহণীয় হতে পারে না। যেমন এমন সব পুরুষ যারা স্ত্রীদিগকে রীতি বিরুদ্ধ কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত দেখে কিন্তু নম্রতার নামে ও সদাচরণের নামে এড়িয়ে যায় অথবা অন্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে দেখে কিন্তু তারা মনে করে যে, এতো মেয়েলোক, আমরা নম্র ব্যবহার করলে কোন দোষ হবে না, অথচ সে অন্যের সম্বন্ধে ধৃষ্টতার সাথে বকাবকি করে যাবে আর আমরা কেবল শুনে সহ্য করে যাব, সেই সকল পুরুষ নিশ্চয় ভুলের উপর আছে। এরূপ করা আদৌ সদাচরণ নহে। কাকেও কারো বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতে দেখছি আর মজা করে বসে তার কথা শুনে যাচ্ছি, তাকে একটু বারণও করছি না, বুঝাচ্ছি না এর নাম সদাচরণ নহে, এরূপ নম্রতা এক পর্যায়ে যুলুমে পরিণত হয়। সুতরাং আমি যখন যুলুমের কথা উল্লেখ করি তখন ইসলামী ব্যাপক পরিভাষায় যুলুমের কথা উল্লেখ করে থাকি। কোন সময় শক্ত ব্যবহার যুলুম, আর কোন সময় নম্র ব্যবহারও যুলুম। মোটের উপর কথাকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উদ্ধৃতি দিয়েছি, কারণ তখন সময় এমন ছিল না যে, বিস্তারিত এসব কথা সকলকে বুঝাতে পারতাম। আমি বলেছি যে, আপনাদের উপর বাড়াবাড়ি হলে আপনারা হযরত আকদাস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের রং ধারণ করেন। হযরত আকদাস মহিলাদের সঙ্গে আচরণের পূত পবিত্র আদর্শ আমাদের উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য রেখে গেছেন যা চিরকাল অমর হয়ে থাকবে, উহা দ্বারা উপকৃত হোন।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলে আলেহী ওয়া সাল্লামের এই রীতি ছিল যে, অনেক বিষয়ে হুযুর তাঁর বেগমগণের বাড়াবাড়ি সহ্য করতেন। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, যেগুলোর উল্লেখ কুরআনে হয়েছে। আল্লাহ্তা'লা তাঁকে নির্দেশ করেছেন যে, নিজ স্ত্রীগণকে বলে দাও, যদি তোমরা পার্থিব জীবন কামনা কর তাহলে এস আমি তোমাদিগকে পার্থিব ধন-সম্পদ দান করি এবং বিদায় করে দিই, সদাচরণের সহিত বিচ্ছেদ করবো, শক্ত আচরণ করবো না; কিন্তু আমার সংগে জীবন যাত্রা করতে পারবে না। এটা চরম এবং

অত্যধিক কষ্টকর সিদ্ধান্তই ছিল, যার পটভূমিকায় কিছু কথা থাকতে পারে। যেহেতু কুরআন করীম সেইগুলোর বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করে নি এজন্য আমাদের কাজ নহে যে, আমরা ঐ সব বিবরণের অনুসন্ধান করি। আদব ও শিষ্টাচার এই শিক্ষাই দেয় যেন আমরা সেই সব কথার খোঁজ না নেই। সাধারণভাবে প্রত্যয় করা যায় যে, নিশ্চয়ই হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম কিছু দুঃখ হয়তো অনুভব করেছেন কোন কষ্ট হয়তো স্পর্শ তাঁকে করেছে। সেই দুঃখ মোচনের জন্য, সেই কষ্ট দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই ঘোষণা করার উপদেশ দান করেছেন এবং তাঁকে দায়িত্ব মুক্ত করে দেন। এর পর তাঁর সতী সাধ্বী স্ত্রীগণ নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে আমূল পূত পরিবর্তন আনয়ন করেছিলেন। কারণ এ ঘটনার পরে আর কোন সতর্কবাণী জানা যায় না এবং এমন কোন ঘটনাও পরিলক্ষিত হয় না যে, হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোন স্ত্রীর প্রতি অভিযোগ এনে তাকে বিচ্ছেদ করেছেন। এটাতো হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লামের সাধারণ আদর্শের বিষয় যার উল্লেখ আমি করেছি যে, তিনি অবশ্যই কোন কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু হুযুর (সাঃ) পরম সহ্য ও ধৈর্য অবলম্বন করেছেন এবং অতি উদার চিত্তে এসব বিষয় এড়িয়ে যেতে থাকেন এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে উপদেশ দান করলেন যে, এমন পরিস্থিতিতে শেষ চিকিৎসা হল বিচ্ছেদ। জামা'তের বন্ধুগণকে এই বিষয়টি মনে গেঁথে নেয়া উচিত। অনেক এমন ক্ষেত্র আছে আছে যে, সংশোধনের চেষ্টা নম্রভাবেই জারী রাখা উচিত; আর উপদেশের ক্ষেত্রে উপদেশ দ্বারাই কাজ করা উচিত; কিন্তু যদি পানি মাথার উপর দিয়ে বয়ে যায় তখন কুরআনে বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী নিজেদের স্ত্রীদিগকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া উচিত যে, এই অবস্থায় আমরা একত্রে থাকতে পারবো না। এইরূপ বিষয় যত শীঘ্র পরিষ্কার হবে ততই ভাল হবে। কিছু সংখ্যক লোক সারা জীবন স্ত্রীদের সংগে অতিবাহিত করে ফেলে; পাঁচ পাঁচ; ছয় ছয় সন্তান হয়ে যায়, তারপরও লাঠি উঠাতে চেষ্টা করে, এইরূপ করা মূর্খতার শামেল। যদি তারা যালেমই ছিল তাহলে এত দিন তোমরা কি করেছ। কুরআন করীম অতি সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি এইভাবে ব্যক্ত করেছে যে, যখন তোমরা স্ত্রীদিগকে বিচ্ছেদ কর তখন তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর; এই কথা স্মরণ কর যে, তোমরা তাদের দ্বারা আরাম পেয়েছ, খোলাখুলিভাবে আনন্দ ভোগ করেছ, এইসব বিষয়ের প্রতি তোমরা কিছু তো খাতির কর, কিছু তো চক্ষু লজ্জার সাথে কাজ কর। যদিও শব্দগুলি এইরূপ ব্যক্ত হয়নি কিন্তু বিষয়বস্তু হুবহু এইরূপেই ব্যক্ত হয়েছে। অতএব পুরুষদিগকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লামের আদর্শকে অনুসরণ করা উচিত। ইহাও তাঁর আদর্শের অন্তর্গত যে, নিয়ম নীতিকে কখনো বিসর্জন দেন নি। পরম ভালবাসা পরম মার্জনার ব্যবহার করা সত্ত্বেও তিনি একবারও নিয়মকে

বিসর্জন দেননি। উল্লেখ্য যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহা সম্বন্ধে রেওয়ায়াত এসেছে যে, একবার হুযুর (সাঃ)-এর কোন স্ত্রীর নিকট হতে কোন বাসনে উপঢৌকন আসলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইহাতে কষ্ট পেলেন এবং সেই বাসনটি ভেঙ্গে ফেললেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উঠলেন এবং নিজ হাতে বাসনটি জোড়া লাগালেন এবং উপদেশ দিলেন যে, ইহার বদলে তাকে একটি নূতন ও ভাল বাসন পাঠাও। হুযুর (সাঃ)-এর অসন্তুষ্টি তাঁর চেহারাতে এত স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছিল যে, তিনি যদিও কোন শক্ত কথা বলেননি কিন্তু ইহার দুঃখ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করলো।

একবার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী মোহতারেমার উল্লেখ হল। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহা নিজের ছোট আঙ্গুলটি দেখিয়ে বললেন, 'সে অর্থাৎ ঐ খর্বাকৃতিনী—'ছেংলী' (ছোট আঙ্গুল)-এর সমান। সম্ভবতঃ ইঙ্গিতটি হযরত সুফিয়া রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহার প্রতি ছিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লাম তার উত্তরে বললেন, আয়েশা! তুমি এমন একটি ছোট কথা বলেছ যে, যদি উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সারা সমুদ্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কত উচ্চাঙ্গের কথা, কত পবিত্র উপদেশ এবং নম্রতার মধ্যে কত শক্ত উত্তর; কিন্তু বড়ই কোমল ও পরম বুদ্ধিমত্তার সাথে তিনি কথাটি উপস্থাপন করেছেন। সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ ব্যক্তি হলে সে সদা এই কথায় কষ্ট অনুভব করতে থাকবে যে, আমার দ্বারা এমন এক ভুল কেন হল যার ফলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লামকে আমার উদ্দেশ্যে এইভাবে উপদেশ দিতে হল। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহার রেওয়ায়াত হতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, আঁ-হুযুরের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলতেন যে, আমাকে সেই দিনও দেখতে হল যেদিন আমি এইরূপ কথা বলেছিলাম যার ফলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন, দেখ হে আয়েশা! তুমি একটি ছোট কথা বলেছ কিন্তু ইহা এত তিক্ত যে, যদি ইহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে গোটা সমুদ্র পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তার রং বদলে যাবে, তার স্বাদ বিস্বাদে পরিণত হয়ে যাবে, তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

মোটের উপর সত্য কথা ইহাই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লাম কখনো নিজ ভালবাসার উপর নিয়মনীতিকে বিসর্জন দেন নি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহুতা'লার যে ভালবাসা আঁ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লামের প্রতি ছিল উহা অতীব উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান এবং সদা ইসলামের ইতিহাসে উহা এক অম্লান ও দেদীপ্যমান ভালবাসার দৃষ্টান্ত স্বরূপ অমর হয়ে থাকবে যে, স্বামীর অন্তরে

স্ত্রীর জন্য কিরূপ ভালবাসা হওয়া চাই। কিন্তু এই ভালবাসার বিনিময়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহাকে নিয়মনীতি বিসর্জন দেয়ার অনুমতি দেন নি। বরং সদা সঠিক উপদেশ দিতে থাকতেন। ইহাকে বলা হয় قوام (কাওয়াম—প্রধান)। قوام শব্দটিই পুরুষদের জন্য কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, আপনারা আসলে قوام। আপনারা যুলুম ও নির্যাতন হতে বিরত থাকুন এবং মর্ম এই ছিল যে, নির্যাতন হতে বিরত রাখুন। এই উভয় বিষয়ই قوام এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি আপনি ক্রোধান্ধ হয়ে পড়েন এবং ছোট ছোট কথায় রাগে বেশামাল হয়ে যান এবং শুধু স্ত্রীকেই ধমকাতে থাকেন না বরং তাঁর পিতা মাতার অন্তরকেও আঘাত করতে থাকেন এবং তাদিগকে বিদ্রূপ ও ভৎর্সনার লক্ষ্যবস্তু বানাতে থাকেন। ইহা উত্তম চরিত্র নহে, কাওয়ামীয়্যত—নেতৃত্ব নহে এবং ইহা কোন পৌরুষ নহে; ইহা হীন ও তুচ্ছ এবং কুটিল স্বভাব বিশেষ। আমি যদি আহমদীদিগকে এইরূপ হীন ও তুচ্ছ এবং কুটিল স্বভাব হতে বিরত রাখি, তাহলে ইহাতে কারো অসন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। আহমদীদের সংগে ভালবাসার ফলেই আমি এইরূপ করি। আমি জানি যে, আমাদের মধ্যে অনেক দুর্বলতা রয়েছে আর এসব দুর্বলতা দূর করা আমার দায়িত্বের অন্তর্গত।

আমার পরম আকাঙ্খা যেন আমাদের প্রতি ঘর জান্নাতের নিদর্শন স্বরূপ হয়। অতএব এই প্রকৃতিগত আকাঙ্খার ফলেই আমি উপদেশ দিই, তখন কোন কোন সময় বাহ্যদৃষ্টিতে শক্ত শব্দও বের হয়ে আসে; কিন্তু এই কথা আসলে কোন তিক্ততার ফলে হয় না; যেমন আমার এইরূপ বলা যে, এমন অবস্থায় আমি তোমাদিগকে আযাবে আলীম (যন্ত্রণাদায়ক আযাব)-এর সুসংবাদ দিচ্ছি। কুরআন করীমেও কোন কোন আযাব সম্পর্কে সাবধান করার জন্য এইরূপই সুসংবাদের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যে, তোমাদিগকে আমরা আযাবের সুসংবাদ দিচ্ছি। এইরূপ সুসংবাদ এমন অবস্থায় দেয়া হয় যখন মানুষ যালেম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে এবং ক্ষমা প্রার্থনার আর কোন সুযোগ বাকি থাকে না। অতএব তখন তার মর্ম এই দাঁড়ায় না যে, নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক সকল পুরুষই যালেম; মর্ম এই ছিল যে, মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা নিজেদের মধ্যে এমন পুণ্য ও পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন কর, যাতে কুরআনের শব্দগুলি এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লামের সতর্ক বাণী তোমাদিগকে আযাবে আলীমের সুসংবাদ না দিতে থাকে বরং আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে চলে আস। আসলে আল্লাহ্‌ তা'লার অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহ্‌ তা'লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং আল্লাহ্‌রই আশ্রয়ে চলে আসা উচিত। সুতরাং আমি আশা করি যে, এই বিষয়টি উপলব্ধি করতঃ আমাদের পুরুষ এবং মহিলারা উভয়ে নিজেদের মধ্যে আমূল পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করবে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ সময় এই উপদেশ দেয়ার পিছনে এই কারণও নিহিত ছিল যে, সব সময়ই আমার এই চেষ্টা থাকে যদি কোন মন্দ বিষয় ঘটে যায় তাহলে উহা হতে

কোন ভাল শিক্ষণীয় বিষয় উদ্‌ঘাটন করা আর এই পদ্ধতি আমি হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলা আলেহী ওয়া সাল্লাম হতে শিখেছি। বস্তুতঃ মৃত্যু হতে জীবন লাভ করার আকাঙ্খা এমন একটি প্রবণতা, যা জাতিসমূহকে উন্নতির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করতে থাকে। প্রত্যেক কষ্টকে ভাল অবস্থায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করা এমন এক গুণ যা প্রাকৃতিক প্রবণতার সংগে সম্বন্ধযুক্ত। পক্ষান্তরে কিছু লোক এমন আছে যারা একবার মৃত্যু বরণ করলে চিরকালের জন্য নিঃশেষ হয়ে যায়। আর কিছু লোক আছে যারা মৃত্যু হতে জীবন লাভ করে এবং পূর্বজীবন হতে অধিক শক্তি সহকারে জীবন পথে অগ্রসরমান হতে থাকে। অতএব, এই কারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি ঐ সময় বিশেষ উপদেশ দিয়েছিলাম। আমার কামনা ছিল যে, প্রত্যেক মহিলা মৃত্যুর ফলে যে মর্ম বেদনা স্পর্শ করে ইহাকে শত শত মহিলার আনন্দে পরিবর্তিত করে দিই না কেন? আমরা উহাকে এমন কল্যাণে কেন পরিবর্তন করে দিই না যার ফলে প্রত্যেক ঘরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যাবে। এবং ইহার প্রাকৃতিক কল্যাণধারা মৃত্যুবরণকারীকেও সিক্ত করতে থাকবে যে, সে-ই পূত পবিত্র উপদেশের কারণ হয়েছে, যার ফলে গৃহসমূহে পুণ্য পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। এই সৎ নিয়্যত এবং সৎ কামনা করে আমি ঐ উপদেশ দিয়েছিলাম উহাতে একতরফা যুলুম আদৌ ছিল না যা কোন ব্যক্তির অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে......ﷺ সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলতে চাই। অনেক বন্ধু শোক প্রকাশের জন্য আসতেন। পুরুষ মহিলা উভয়েই দূর দূর থেকে বড় মহব্বতের সাথে আসতেন এবং ব্যাপক সংখ্যায় চিঠি-পত্রাদিও লিখতেন। আমি ইউ, কে-এর আমীর সাহেবের নিকট বলেছিলাম, জামা'তকে বলে দিন যে, আমার অন্তর ভালরূপেই অবহিত এবং সকল আহ্‌মদীদের সম্পর্কে, যারা আমাকে বলেছিল তাদের সম্পর্কেও এবং যারা বলেন নি তাদের সম্পর্কেও আমার গভীর অনুভূতি আছে। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীদের অবস্থার উপর যতদূর পর্যন্ত আমার দৃষ্টি আছে আমি তাদের আবেগ ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবহিত আছি এবং আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাদেরকে সম্মান করি। কিন্তু যদি এইভাবেই অনবরত জামা'তের পর জামা'ত আসতে আরম্ভ করে তাহলে তাতে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে এজন্য আপনি নম্রতা, মহব্বত ও স্নেহ-মমতার সাথে তাদিগকে বুঝিয়ে দিন যে, আমি অবজ্ঞা ভরে তাদিগকে বাঁধা দিচ্ছি না বরং কতকগুলি খারাপির কারণে, যা আমার দৃষ্টিতে রয়েছে, মানা করছি।

প্রথমতঃ কথা এই যে, কিছু দিন পরে যখন দুঃখ বেদনা চরম স্থান থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে আরম্ভ করে যেরূপভাবে পারা গরমে উপরে চড়তে আরম্ভ করে এবং ঠাণ্ডায় নীচে নামতে আরম্ভ করে, দুঃখ বেদনারও এই অবস্থাই, যখন নীচে নামতে আরম্ভ করে তখন এক পর্যায়ে এমন স্থানে নেমে পড়ে যে, দুঃখ বেদনার কারণে সহানুভূতির জন্য কোন

প্রাকৃতিক আবেগ মানুষকে সজোরে বাধ্য করে না বরং সংকল্প ও চেষ্টা এবং চিন্তা করে কতক বিষয় বলতে হয়। যখন মৃত্যুর সংবাদ তাজা ছিল বা কিছু দিন জীবিত ছিল তখন লোক ব্যাকুল হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসতো তখন তাদিগকে বাধা দেয়া ঠিক হতো না। কিন্তু দুঃখ বেদনা যখন সেই স্থান থেকে নেমে পড়েছে অতঃপর এই চিন্তা করে যে, আমাদিগকেও যাওয়া উচিত, অমুক গিয়েছে, অমুক গিয়েছে আর আমরা কেন যাব না? যখন প্রস্তুত করা পদ্ধতিতে প্ররোচনার মাধ্যমে প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করা হয় তখন ইহাতে কিছু কৃত্রিমতা সৃষ্টি হয় তখন কিছু এমন লোকও এর মধ্যে শামিল হয়ে যান যারা কষ্টে আছেন, যারা আর্থিক ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করেন অথবা কর্মব্যস্ত থাকার দরুন তারা বাধ্য হন অন্য কোন কাজকে বিসর্জন দিয়ে আসতে, ফলে তাদের অন্তরের উপর বোঝার সৃষ্টি হয়ে যায়। আর কিছু এমন লোকও আছে যারা এই কথা বলতেও পারে না। কিছু লোক মনে করে যে, যদি আমরা 'না', বলি তখন যে আমাদিগকে উপদেশ দিয়েছে অথবা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সে তো মনে করবে যে, হয়তো তার অন্তরে মহব্বতের অভাব আছে, সম্পর্ক কম আছে। এমন একটা পুণ্য কর্মের জন্য বলা হল, আর সে 'না' বলে উত্তর দিয়ে দিল। মোটের উপর লোক বিনা কারণে এভাবে মনকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে ফেলে এবং কৃত্রিমতা ও কষ্টকল্পনার অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আমার সময়ও বাধ্য হয়ে এহেন কাজে ব্যয় করতে হয় যা আমি জরুরী মনে করি না। কারণ আমি জানি যে, দুঃখ বেদনার যে প্রাথমিক জোয়ার বয়ে গেছে উহাতে পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত এবং উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত গোটা জামাতই শরীক ছিল, উহা প্রকাশ করা হয়ে থাকুক বা না থাকুক। যেরূপভাবে গোটা বিশ্বে ব্যাকুল অন্তর দিয়ে দোয়া করা হয়েছিল, সেই সব দোয়াসমূহের জ্ঞানও এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট যে, জামা'ত এই মৃত্যুর কারণে অসাধারণভাবে ব্যথা অনুভব করেছে এবং কোন কোন অবস্থাতে তো এত ব্যথা অনুভব করা হয়েছে যে, আমি না তারা আমার প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করবে, অথবা আমি তাদের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করবো। অতএব, যখন এই সব অবস্থার প্রতি আমার দৃষ্টি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কেন আমরা এইসব বিষয়কে রসম হিসাবে এত দীর্ঘ করতে চলে যাবো? এবং এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবো যার ফলে কৃত্রিমতা সৃষ্টি হউক এবং প্রাথমিক আবেগসমূহের পবিত্রতার উপর কিছু ময়লা পড়ুক। এই দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি আমীর সাহেবের নিকট বলেছিলাম যে, আপনি আমার তরফ থেকে জামা'তসমূহকে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দিন যে, কোন সময় সাধারণ সাক্ষাতের যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে উল্লেখ করে দিবেন; কিন্তু ইহার কোন প্রয়োজন নেই; ইহাতে কোন কোন সময় উপকারের পরিবর্তে কষ্ট হয় এবং মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। তাই যথাসাধ্য এই বিষয়টিকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেয়া উচিত।

সাথেই আগন্তুককে আমি উপদেশ দিতে চাই, যার মধ্যে এখন আমি গোটা জামা'তকে শামিল করছি, কারণ এখন থেকে আমি আশা করবো যে, রসম হিসাবে প্রতিনিধি দলের

আগমন বন্ধ হয়ে যাবে, সেই উপদেশটি যা পূর্বেও ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, উহা এই যে .....اِنَّا لِلّٰہِ এর পয়গামটি উপলব্ধি করা উচিত। আমাদিগকে এই উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কারো জীবনের বা অর্থের ক্ষয়ক্ষতি হয় তখন যেন اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ বলি। এই পয়গামটি সাধারণতঃ লোকে বুঝে না। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ...اِنَّا لِلّٰہِ ঐ বস্তুর উপর পাঠ করা হয় যে জিনিষটি হাত হতে নষ্ট হয়ে গেছে বা চলে গেছে অথচ এই .....اِنَّا لِلّٰہِ আমরা আমাদের নিজেদের উপর পাঠ করে থাকি। খোদাতা'লা তো এইভাবে বলেননি اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ যে জিনিষ তোমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে উহা আল্লাহ্‌র ছিল, উহা তো আল্লাহ্‌রই দিকে ফিরে যেতো; অতএব ইহার জন্য দুঃখ কিসের? আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইহা পড়বে اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ আমরা আল্লাহ্‌র এবং অনিবার্যভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবো। অতএব প্রত্যেকটি মৃত্যু ভাবী জীবনেরই সংবাদ দেয়, কোন ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ দেয় না। আপনারা যদি .....اِنَّا لِلّٰہِ এর পয়গামটি উপলব্ধি করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে, বস্তুতঃ এই ..... اِنَّا لِلّٰہِ মৃত্যুবরণকারীর উপর নহে বরং যারা জীবিত আছে তাদের উপর পাঠ করা হয়। তারা নিজেদের উপর পাঠ করে এবং নিজদিগকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, যার যাওয়া তকদীরে ছিল সে তো চলে গেল; সে খোদার তকদীরের সামনে শির নত করে নিলো। আমাকেও যেতে হবে। প্রস্থানকারীর প্রস্তুতির সময় শেষ হয়ে গেল, এখন সে আর কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আমার জন্য এখনও কিছু সময় বাকি আছে। সুতরাং সেই পরিণাম সম্পর্কে, থাকে আপনি নিজ চোখের সামনে অদৃশ্যরূপে দেখেছেন .....اِنَّا لِلّٰہِ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, তোমারও এই পরিণামই ঘটবে; কোন দিন তুমিও এইরূপেই প্রাণ ত্যাগ করবে, করতে হবে এবং লোক সকল... اِنَّا لِلّٰہِ পড়তে থাকবে এবং ঐ সরল লোকগুলিও উদাসীন হওয়ার দরুন উপলব্ধি করবে না যে, এই ...اِنَّا لِلّٰہِ তার উপর নয় বরং আমাদের নিজেদের উপর পড়া উচিত। অতএব ...اِنَّا لِلّٰہِ এই পয়গাম বহন করছে যে, হে খোদা! আমরা বুঝেছি, আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করেছি যে, আমরা তোমারই এবং তোমা হতেই আমরা অস্তিত্বে এসেছিলাম। اِنَّا لِلّٰہِ এর মর্ম কেবল এই নহে যে, তোমার, বরং এই মর্মও বুঝায় যে, আমরা তোমা হতেই সৃষ্টি হয়েছি; তোমার অস্তিত্বই বস্তুতঃ প্রকৃত ও চিরস্থায়ী, ইহা ব্যতিরেকে কিছুই নহে। যা কিছু অস্তিত্বে প্রকাশিত হয়, আর যিনি সৃষ্টিকারী তিনিই আসলে মালিকও। অতএব ..اِنَّا لِلّٰہِ এর মধ্যে এই সব কথা শামিল যে, হে খোদা! আমরা এইজন্য তোমার যে, তোমা হতেই আমরা অস্তিত্বে এসেছি, তুমি আমাদিগকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বের পোশাক উপহার দান করেছ; তোমা হতে আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার যাত্রা এক দিন অবশ্যই শেষ হবে এবং আমরা পুনরায় তোমার দিকে ফিরে আসবো। তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমাদের যে জীবন কাল অতিবাহিত হলো, তখন আমরা যা কিছু পেয়েছি তৎসম্বন্ধে আমরা তোমার নিকট উত্তর

পেশ করবো। এই বিচ্ছেদ কালটা কি কি অবস্থার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হল সেই অবস্থার দিকে انا لله و انا اليه راجعون আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আপনাকে সাবধান করে খোদা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে আপনি কি খোদারই জন্য হয়ে এবং খোদারই জন্য থেকে কালাতিপাত করেছেন, না অন্যের হয়ে এই সময়টা অতিবাহিত করেছেন। যদি অন্যের হয়ে এই সময় অতিবাহিত করে থাকেন তাহলে কোন মুখ নিয়ে খোদার নিকট ফিরবেন? ...انا لله এই আহ্বানটি প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাঠ করে উপলব্ধি করা উচিত এবং নিজের মধ্যে এক আমূল পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত। সর্ব প্রথমে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা উচিত যে, আমরা দুনিয়াতে যারই হয়ে থাকি না কেন আসলে আমরা খোদার, তিনিই আমাদের মালিক। আমরা আমাদের স্ত্রীরও নই, বোনদেরও নই, পিতামাতারও নই, সন্তানদেরও নই। যার দিকে আমরা ফিরে যাব আমরা তাঁরই। যখন তিনি ডাক দিবেন তখন আমাদের না করার কোন অধিকার নেই। অতএব খেয়াল রাখা উচিত যে, যখন আমরা অপরের হই, তখন যেন অপরের হয়েও খোদাকে না ছাড়ি; খোদার সংগে সম্পর্ককে ছিন্ন করে সম্পূর্ণরূপে অপরের না হয়ে যাই। যদি এই অবস্থায় অপরের হয়ে যান তাহলে যখন আপনি খোদার দিকে যাবেন তখন অপরের হয়েই যাবেন এবং অপরিচিত হয়েই যাবেন। সেই অবস্থায় আপনাকে খোদার সামনে জওয়াবাদিহি করতে হবে। প্রবাদ অনুযায়ী বলা হবে, তাঁকে মুখ দেখাবারও যোগ্য থাকবেন না। সুতারং প্রত্যেক মৃত্যুতে জীবনের আহ্বান নিহিত থাকে। আমাদিগকে প্রত্যেক মৃত্যু হতে জীবনের আহ্বান উদঘাটন করা উচিত। যদি মৃত্যুবরণকারী নিজ প্রিয়জনকে জীবন দান করে যায় তাহলে উহা কত মোবারক মৃত্যু। যদি তাদের মধ্যে জীবনের অনুভূতি জাগ্রত করে যায় এবং তাদিগকে স্মরণ করিয়ে যায় যে, তোমরা সেখানেই আসবে যেখানে আমি যাচ্ছি, কিন্তু তোমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসবে। যদি আমার জীবনের কিছু দিন গাফিলতির মধ্যে অতিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে; কিন্তু নিজেরা স্বজ্ঞানে এই কথাটি মনে গেঁথে রাখবে যে, আমাদিগকেও অবশেষে খোদার দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর সম্মুখে নিজেদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জওয়াবদিহি করতে হবে।.....انا لله এর মধ্যে এই যে আহ্বানটি নিহিত রয়েছে ইহা বড়ই মোবারক এবং জীবন দানকারী আহ্বান। মৃত্যু হতে জীবন লাভ করার ব্যাপারে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াসসালাম বহু জায়গায় বারংবার উপদেশ দান করেছেন। তাঁর মলফুযাতের মধ্যেও, তাঁর কিতাবাদির মধ্যেও এবং তাঁর সাধারণ লেখার মধ্যেও এই উপদেশ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, মৃত্যু হতে শিক্ষা লাভ কর এবং সদাসর্বদা ইহাকে লক্ষ্যবস্তু করে রেখ যে, তোমাদিগকে খোদার সম্মুখে হাযির হতে হবে। হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাতো ওয়াস সালামের ঐ নযমটির মধ্যেও যে:

اک نہ اک دن پیش ہوگا تو خدا کے سامنے
چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے

এই মর্ম পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুটিত হচ্ছে এবং এইদিকেই মনোযোগ আকর্ষণ করছে যে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত গ্রহণ কর।

(অর্থ : একদিন না একদিন তুই খোদার সামনে উপস্থিত হবি, নিয়তির সামনে কারও কিছু চলতে পারে না)।

কোন কোন সময় যুবকরা মনে করে যে, তাদের এখনো অনেক দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, অনেক সময় আছে। কিছু কাল দুনিয়াতে ভোগ বিলাস করে নিই, পরে কি হবে দেখা যাবে। কিন্তু মৃত্যুর তো কোন নিশ্চিত খবর নেই, ইহার কোন নির্দিষ্ট সময়ও নেই ; খোদা যখন চাইবেন যাকে চাইবেন, ডেকে নিবেন। তাই انا لله এর আহ্বান উপলব্ধি করার পর প্রত্যেককে সেই দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, وتوفنا مع الابرار অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা গাফিলতির অবস্থায় অনেক সময় অতিবাহিত করে ফেলেছি ; এমন অবস্থা আমাদের উপর আরো আসতে পারে যখন আমরা তোমার হওয়া সত্ত্বেও অপরের হয়ে যেতে পারি। অতএব আমাদের এই আকুল আবেদন যে, তুমি আমাদিগকে ততক্ষণ পর্যন্ত ডেকো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা তোমার হয়ে যাই ; وتوفنا مع الابرار এর মর্ম ইহাই যে, আব্‌রারদের মধ্যে শামিল করিও। আব্‌রার ঐ সকল লোককে বলা হয় যাদের পুণ্য তাদের দুর্বলতার উপর প্রাধান্য লাভ করে ফেলে এবং যখনই তারা মৃত্যু বরণ করে তারা আল্লাহ্‌র দরবারে পুণ্যবানদের মধ্যে শামিল থাকে। অতএব আপনাদের নিজেদের জন্য এই দোয়াও করতে থাকা উচিত।

যে ব্যক্তি মৃত্যু সম্পর্কে সাবধান থাকে তাকে তার জীবদ্দশায়ই এক নবজীবন দান করা হয় এবং ...انا لله এর পয়গামকে উপলব্ধি করার ফলে সে 'আলমে বাকা'তে (চিরস্থায়ী জগতে) প্রবেশ করে। ...انا لله এর পয়গাম তাকে মৃত্যুর ভয় করতে দেয় না বরং মৃত্যুর ভয়কে বিনাশ করে ফেলে। আপনি যদি পূর্ণরূপে এই পয়গামকে উপলব্ধি করতে পারেন তা হলে আপনি জানতে পারবেন যে, আপনি খোদার জন্য খোদার সাথে আছেন এবং খোদার সাথে থাকবেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাবেন। খোদার নৈকট্যের যে এই চিরস্থায়ী অনুভূতি এবং তাঁরই হওয়ার অনুভূতি, এই পয়গাম যা আপনাকে প্রদান করা হয় যে, তোমরা যদি তার হয়ে থাক তবে তাঁর হয়ে দেখাও, ইহা এমন এক জীবন দানকারী পয়গাম যা মানুষকে 'আলমে বাকা'তে (চিরস্থায়ী জগতে) নিয়ে যায়, মৃত্যুর চৌকাঠ তার প্রথম জীবন এবং দ্বিতীয় জীবনের মধ্যে কোন প্রভেদ সৃষ্টি করে না বরং একটি কদম উঠানোর বিষয় মাত্র। এক কদম এখান থেকে উঠলো এবং অপর পার্শ্বে পৌঁছে গেল ; কিন্তু এই প্রকারের লোক সদা সর্বদার জন্য অমর হয়ে গেল। সুতরাং.....انا لله এর মধ্যে চিরস্থায়ী জীবনের পয়গাম রয়েছে।

আমি আমার কন্যাদিগকে তাদের মাতার মৃত্যুর পর যেসব কথাবর্তা বলেছি সেইগুলোর মধ্যে এই কথাটিও ছিল যে, আমি অনেক চিন্তা করেছি, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না ভয় করি খোদার সম্মুখে হাযির হওয়াকে; কিন্তু মৃত্যুর কোন ভয় নেই আমার জন্য এটা সাধারণ বিষয়; যেমন আজকে আসলো বা কালকে আসলো একেবারেই কিছুই যায় আসে না। যদি কোন চিন্তা হয় তাহলে কেবল ঐ সকল লোকের দুঃখ সম্বন্ধে চিন্তা হয় যারা পিছনে থেকে যাবে কেবল ইহা ছাড়া মৃত্যুর কল্পনা করতে গিয়ে আমি অজানার অপরিচয়ের কিছুই মনে করি না। আমার দৃষ্টিতে এমন কোন কষ্টদায়ক বিষয় নেই যার ফলে আমি বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত হতে পারি। বস্তুতঃ এই যে পয়গাম আমি পেয়েছি ইহা ... اِنَّا لِلّٰہِ হতেই পেয়েছি। যখন এই বিষয়ে আমি চিন্তা করলাম তখন উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমরা যাঁর, কাল যখন তাঁর দিকে ফিরে যাব তখন তাঁর হবো না বরং এই জন্য ফিরে যাবো যে, আমরা তাঁর। এই দুই বিষয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। তাঁর নিকট ফিরে আমরা তাঁর হবো না বরং আমরা তাঁরই, এই জন্য ফিরে যাবো। এখন যখন আমরা তাঁরই, ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা তাঁর না হয়ে থাকি তাহলে ইহা নিশ্চয়ই ভয়ের ব্যাপার, তাহলে ইহা বড়ই মর্মান্তিক ও কষ্টদায়ক অবস্থা হবে। যতদূর ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন, এই পরিণামকে তো কেহই ঠেকাতে পারবে না, সে যত কিছুই করুক না কেন। সর্বাধিক বড় মানুষকেও সবশেষে যেতে হবে, সর্বাধিক ছোট মানুষকেও যেতে হবে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই অবশেষে সেখানে যেতে হবে। বড় বড় চিকিৎসাবিদ যে যে রোগের চিকিৎসায় পারদর্শী, অনেক সময় আল্লাহ্‌ তা'লা তাদিগকে তাঁর নিয়তি ও শক্তি দেখিয়ে দেন যে, প্রকৃত প্রাধান্য আমারই; তিনি তাদিগকে সেই রোগেই মৃত্যু দেন যে যে রোগের চিকিৎসায় তারা খ্যাতি লাভ করে থাকে। আমাদের পাকিস্তানে বড় বড় হার্ট স্পেশ্যালিষ্ট (হৃদ রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ) যারা ছিলেন তারা হৃদরোগেই মারা গিয়েছেন। তাদের জ্ঞান তাদের কাজে আসলো না। সুতরাং চিকিৎসা ও আরোগ্যের জ্ঞান এবং দোয়া উভয়েই মৃত্যুর সামনে অক্ষম হয়ে যায়। আর.....اِنَّا لِلّٰہِ যে শক্তির সাথে এর বিষয়বস্তুকে আমাদের সামানে রেখেছে তা এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; তাই তো মৃত্যুর সময় اِنَّا لِلّٰہِ ...পাঠ করা হয়। খোদার অস্তিত্ব একটি স্পষ্ট সত্য এবং চির সত্য। তাঁর স্বত্বাধিকার স্থায়ী, বাকি সবই অস্থায়ী। প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে স্বত্বাধিকারের সংগে, কারণ প্রকৃত স্বত্বাধিকার অবশেষে স্পষ্ট রূপ-সহকারে প্রকাশিত হবে এবং মধ্যবর্তী সকল বস্তুরই বিলুপ্তি ঘটবে যার মধ্যে মানুষ নিজেকে অস্থায়ীভাবে হউক বা স্থায়ীভাবে হউক স্বত্বাধিকারী মনে করে থাকে। সকল স্বত্বাধিকারই নিঃশেষ হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআন করীমে مالک یوم الدین এর এই ব্যাখ্যা এসেছে যে,

وما ادرک ما یوم الدین ۝ ثم ما ادرک ما یوم الدین ۝ یوم لا تملک لنفس شیئا ۝ والامر یومئذ للّٰہ

অর্থাৎ তুমি কি জান যে, يوم الدين কি জিনিস? যখন আমরা مالك يوم الدين বলি তখন খোদতা'লা বলেন যে, তুমি কি কোন দিন চিন্তাও করেছ যে, يوم الدين কি জিনিস। পুনরায় বলছি, কিরূপে তোমাকে বুঝাবো যে, يوم الدين কি জিনিস? يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً অর্থাৎ কোন অস্তিত্ব না নিজের জন্য, আর না অন্য কারো জন্য কোন জিনিসের মালিক হবে; কোন আত্মা না অন্য কোন আত্মার মালিক হবে, না অন্য কোন আত্মার আমানতদার হবে, না নিজের মালিক হবে, না নিজের জন্য কোন আমানত নিজের নিকট রাখতে পারবে, সব কিছুই খোদার দিকে ফিরে যাবে। শুধু একজন মালিক থাকবেন, আর তিনি হবেন আল্লাহ্‌ তিনি ছাড়া অন্য কোন মালিক থাকবে না। যখন স্বত্বাধিকার নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন উহার নামই হবে মৃত্যু। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া বাকি সবারই স্বত্বাধিকারের মধ্যে মৃত্যু সংযুক্ত আছে, কারণ ঐ সব স্বত্বাধিকার চিরস্থায়ী হতে পারে না, এইজন্য কেহই চিরজীবন পেতে পারে না।

খোদার দিকে ফিরে যাওয়ার অর্থ তাঁর স্বত্বাধিকারের বিষয়টি উপলব্ধি করিয়ে ইহা ব্যক্ত করা যে, প্রকৃত মালিক তিনিই। এই জন্য তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। আর যদি সেই সত্বাধিকার আপনি অপহরণ করে থাকেন; মালিক না হয়েও উহার অপব্যবহার করে থাকেন এবং লোকের মালিক হয়ে থাকেন, তাদের উপর অবৈধ দখল করে থাকেন, তাদের সম্মান, প্রাণ, ধন সম্পদ, তাদের আনন্দ ও নিরাপত্তা আপনার হাতে সংরক্ষিত ও নিরাপদ না থাকে, আপনি তাদের উপর অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি তখন প্রকৃত মালিকের সামনে বাড়াবাড়ি করে থাকেন, তাহলে যখন আপনি প্রকৃত মালিকের সামনে পেশ হবেন তখন নিশ্চয় আপনাকে জওয়াবদিহি করতে হবে।

অতএব.....انا لله এর মধ্যে অনেক গভীর ও বিস্তারিত জীবনের পয়গাম রয়েছে। প্রত্যেক মৃত্যু মোমেনকে এই নব জীবন দানকারী অমৃত পান করিয়ে যায়। যখন সে انا لله و انا اليه راجعون পড়ে তখন ইহা তার অমরত্বের অমৃতধারা স্বরূপ হয় যা সে পান করে। কিন্তু লোক আশ্চর্য ধরণে ইহা পান করে যে, এই অমৃত তারা হজম করতে পারে না। তারা বুঝেই না যে, তারা কি পান করছে। তারা মনে করে যে, এই মৃত্যুবরণকারীর জন্য বিষ পেয়ালা ছিল যার উল্লেখ আমি করছি। আমি এই কথা বলছি যে, সে তো চলে গেল এবং শেষ হয়ে গেল, এর পরে আর কিছুই নেই, আমি বাকি আছি। সম্পূর্ণ উল্টো কথা। পয়গাম ছিল এই যে, তুমি বাকি থাকবে না। সাময়িকভাবে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ো না। এই পরলোকগমণকারী এই বিষয়কে নিশ্চিত করে গেছে যে, তুমিও থাকবে না, অবশ্যই তুমিও তোমার খোদার দিকে ফিরে যাবে। অতএব এত নিশ্চিত সত্যকে ভুলে যাওয়া উদাসীনতার মধ্য দিয়ে যীবন যাত্রা করা এবং অন্যায় অবস্থার ভিতর দিয়ে জীবন যাত্রা করা পরম অন্যায়ের

(অবশিষ্টাংশ ২৯ পাতায় দেখুন)

কোরআনের দৃষ্টিতে দেশ ভ্রমণ

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

পবিত্র কোরআন এবাদতকারী, সেজদাকারী, রুকুকারীদের সমমর্যাদায় সফরকারীর উল্লেখ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এবাদতকারীর ন্যায় সফর বা ভ্রমণকারীকেও সুসংবাদ প্রদান করেছেন (তাওবা: ১১২ আয়াত)। এখানে এও উল্লেখযোগ্য যে, বেশী বেশী ভ্রমণকারীকে আরবীতে মসীহ বলা হয়। মসীহ একটি অতি সম্মান জনক খেতাব। এই খেতাবটি ভ্রমণকারীর জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় ভ্রমণের মর্যাদা বহু বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। মহানবী (সা:) বলেছেন, 'জ্ঞান অন্বেষণে প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশেও যাও।' আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে এই গোলার্দ্ধের জানা পৃথিবীর মধ্যে চীনই ছিল সব চাইতে দুর্গম ও দূরবর্তী স্থান। ঐ সময় অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, প্রভৃতি অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বনবী (সা:) বলেছেন, যে সৎ উদ্দেশ্যে সফরে থাকে সে আল্লাহ্র পথে থাকে এবং তার দোয়া আল্লাহ্-তালা কবুল করে থাকেন ইত্যাদি। এক কথায় সৎ উদ্দেশ্যে সফর এবাদতের মধ্যে গণ্য। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম ভ্রমণের জন্য এভাবে আর উৎসাহ প্রদান করে না।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ওয়া আরযুল্লাহে ওয়াসিয়াতুন (যুমার: ১১ আয়াত) অর্থাৎ—আল্লাহ্র পৃথিবী সুপ্রশস্ত। কিন্তু এই সুপ্রশস্ততা সম্বন্ধে এও বলা হয়েছে যে, হুয়াল্লাযী জায়ালা লাকুমুল আরযা জালুলান ফামশু ফি মানাকিবিহা (মুলক: ১৬আয়াত) অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম ও বসবাসযোগ্য করেছেন, সুতরাং তোমরা এর বিস্তীর্ণ পথে ভ্রমণ কর। সুগম এবং বসবাসযোগ্য পৃথিবী বলায় এ কথাই বুঝায় যে, সমগ্র পৃথিবীই গোটা মানব জাতির। কোন এক গোত্র, গোষ্ঠী বা দেশের মানুষের নয়। যে কোন অংশে বাস করার অধিকার যে কোন মানুষেরই রয়েছে। যদিও আজ কাল রাজনৈতিক স্বার্থে বিশাল পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করে তাতে দখলকারীদের একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করা হয়েছে।

আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীকে সুগম বলার মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটি হল, এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ অতি সহজে বিশ্বের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যেতে পারবে। যাতায়াত ব্যবস্থায় অকল্পনীয় উন্নতি হবে। পাহাড়, সাগর জঙ্গল অতিক্রম করে মানুষ অনায়াসে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত ভূভাগে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। এই গোলার্দ্ধ ছেড়ে অপর গোলার্দ্ধে গিয়ে মানুষ বসতি স্থাপন করবে। নূতন নূতন যন্ত্র যানের আবিস্কারের ফলে অতি সহজেই জলে স্থলে, সাগরে নগরে ভ্রমণ করা যাবে। বায়ু যানে চড়ে মানুষ অতি অল্প সময়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে এক গোলার্দ্ধ থেকে অন্য গোলার্দ্ধে চলে যেতে পারবে। হাদীসে ছিল, ইয়াতরা কান্নাল

কিলাসু ফালা ইউসআ আলায়হা; অর্থাৎ ঐ যুগে উট বেকার হয়ে যাবে। উটে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাবে না। দূর যাত্রার জন্য জাহাজ ট্রেন, মোটর এবং উড়ো জাহাজ ব্যবহৃত হবে। উট, ঘোড়া, গাধা, হাতী আর বাহন হিসাবে গণ্য হবে না। কত সত্য ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন, আওয়ালাম ইয়াসিরু ফিল আরযে ফা ইয়ানযিরু কাইফা কানা আকিবাতুল্লাযীনা কানু মিন কাবলিহীম (মোমেন: ২২ ও ৮৩ আয়াত; রূম: ১০ আয়াত, ফাতের: ৪৫ আয়াত) অর্থাৎ—তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখে না যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? এ থেকে বুঝা যায় যে, ইতিহাস জানতে হলেও পৃথিবী ভ্রমণ করতে হবে। দেখতে হবে প্রাচীন কীর্তিসমূহ। ধ্বংসাবশেষ থেকে জানতে হবে অতীত জাতিসমূহকে। কত দেশে কত ভাবে ছড়িয়ে আছে নানা পুরাকীর্তি, আদিকালের স্মরণ চিহ্ন। এর ফলে শুধু জাগতিক জ্ঞানই বৃদ্ধি পাবে না, আধ্যাত্মিক চক্ষুও উন্মোচিত হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) তাঁর প্রখ্যাত 'সয়রে রূহানী' গ্রন্থে এহেন তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি আসরে কাদীমা বা প্রাচীন ধ্বংসস্তুপের মধ্যে দর্শন করেছেন অফুরন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার। অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'লা বলেছেন, আফালাম ইয়াসিরু ফিল আরযে ফাইয়ানযিরু কাইফা কানা আকিবাতুল্লাযীনা মিন কাবলিহীম (মুহাম্মদ: ১১ আয়াত) অর্থাৎ তারা কি জগৎ ভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই যে, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের কি পরিণতি হয়েছিল? এথেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন চান যেন মানবজাতি সাধ্যমত জগতটাকে দেখে। এই দেখার ফলে ইতিহাসকে জেনে যেমন নিজেরা সতর্ক হবে, ভুল সংশোধন করবে তেমনি তাদের জ্ঞানের পরিধিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।

আজকাল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা হচ্ছে। আমি মনে করি সমগ্র বিশ্বটাই হল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের তাকিদ করা হয়েছে একটি ছোট্ট শব্দে—ইকরা। ইকরা দ্বারা যে পাঠের কথা বলা হয়েছে তা শুধু পুঁথি পুস্তকের পাঠই নয়। উন্মুক্ত বিশ্ব এবং প্রকৃতিকেও পাঠ করতে হবে। দেখতে হবে জানতে হবে তারপর কলমের মাধ্যমে তা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। কলম, কালি, ছাপা কাগজের মাধ্যমে তা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের দ্বারে। চার দিকের সংবাদ পৌঁছাতে হবে চতুর্দিকে। ইংরাজীতে সংবাদ অর্থে যে News শব্দটি ব্যবহার হয় তার অর্থ হল North East West South অর্থাৎ উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের খবর। এই চারটি দিকই বেষ্টন করে আছে সারা জাহানকে। আমরা ছোট বেলায় একটি কবিতা পড়েছিলাম পাঠ্য পুস্তকে।

থাকব না আর বদ্ধ ঘরে,
দেখব এবার জগৎটারে।

বিশ্ব ভ্রমণের জন্য কি সুন্দর প্রেরণা বাক্য! নানা দেশে নানা মানুষ এবং ভাষার সংস্পর্শে এলে হৃদয়েরই প্রশস্ততা বাড়ে। অভিজ্ঞতার আলোকে কূপমণ্ডুকতা দূরীভূত হয়। বিশ্বের

বিরাটত্ব মানুষকে ক্ষুদ্রত্ব থেকে মহত্বে, বিশালতায় নিয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'লা হুকুম দিচ্ছেন, কুল, সিরু ফিল আরযে, ফানযুরু কাইফা কানা আকিবাতুল্লাযীনা মিন কাবলু (রূম : ৪৩ আয়াত)। এখানে 'কুল' শব্দ দ্বারা নির্দেশ বুঝাচ্ছে। তাই আমার মনে হয় অনেক সময় সফর করা ফরয হয়ে যায়। আর এথেকেই বিশ্বভ্রমণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

আমার নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমি পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের নানা অঞ্চল সফর করে বহু কিছু শিখেছি। হিমালয়ের কাশ্মীর থেকে সাগরের বুকে আন্দামান তক বিস্তৃত ভূখণ্ডের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে কত কথা। অতীতে রাজ রাজাদের নির্মিত ইমারতের গাথাতে পড়েছি বহু অজানা তথ্য। মধ্য প্রাচ্যের মক্কা মদীনায়, ইউরোপের বিলাত রাশিয়ায় দেখেছি কত শত ঘটনার সাক্ষী। শুধু কি তাই?। টেকনাফ থেকে পঞ্চগড় পর্যন্ত নিজ দেশের মাটিতে দেখেছি অতীতের কত কিছু। বাড়ীর কাছে আরশি নগর এর আগে কখনও দেখা হয়নি চক্ষু মেলে। তাই দেখতে হবে নিজ দেশকে, দেশের মানুষ ও মাটিকে। নিজের দেশকে দেখেই এ দেশের এক কবি বলেছিলেন,—

নানা বরণ গাভীরে, একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম, একই মায়ের পুত।

এই সামান্য, এই ভেদহীন উপলব্ধি জন্ম নিয়েছিল ভ্রমণের ফলেই। অনেকে মনে করে টাকা ছাড়া ভ্রমণ করা অসম্ভব। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। অতীতে এবং বর্তমানেও বহু লোক পদব্রজে বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন। ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং এর কথা কে না জানে! ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে এরা অমর হয়ে আছেন। সাইকেলে চড়ে লোক বিশ্ব-ভ্রমণ করছে। খোদ্দামরা সাইকেলে চড়ে সারা বিশ্বে সত্যের বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে। আর হয়ত এজন্যই খলীফাতুল মসীহ খোদ্দামদেরকে সাইকেল চালাতে উৎসাহিত করেছেন। তবলীগ করতে হলে ভ্রমণ করতেই হবে। আমাদের ত্যাগী মোবাল্লেগেরা ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার কোণে কোণে ভ্রমণ করেছেন কুরআনের বাণী নিয়ে। দ্বারে দ্বারে, ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন তৌহীদের বাণী।

আমি কানাডার আমীর সাহেবের আমন্ত্রণ পেয়ে আমেরিকা যাত্রা করছি। এটি আমার প্রথম আমেরিকা যাত্রা। উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ মসজিদের উদ্বোধন করবেন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আই:)। আমাদের প্রাণ প্রিয় খলীফা পাঁচটি মহাদেশের বহু অঞ্চল সফর করেছেন। আমার এই আমেরিকা যাত্রায় স্মরণ করছি আমেরিকার প্রথম মোবাল্লেগ হযরত ডঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেককে (রা:)। তৎসঙ্গে আমেরিকায় ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশের দুই কৃতী পুরুষ সুফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী ও আব্দুর রহমান খান বাঙ্গালী কেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এঁদের কুরবানীর ফলেই আজ সমগ্র আমেরিকা মহাদেশে ইসলামের জয় জয়কার হচ্ছে।

আমি খোদা চাহেত সিঙ্গাপুর জামাত পরিদর্শন করে ফ্রাঙ্ক ফোর্ট হয়ে কানাডার টরেন্টো যাব। সেখান থেকে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন জামাত দেখে ক্যালিফোর্ণিয়া জামাতে যাব। ঐ জামাতে বহু বাঙ্গালী আহমদী আছেন। আমার দুই মেয়েও ওখানে আছে।

ওয়াশিংটন মিশন

আমার এই সফর এক গোলার্দ্ধ থেকে অপর গোলার্দ্ধে। এখানে যখন দিন তখন ওখানে রাত। আহমদীয়াতের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিম দর্শনের সুযোগ করে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহে রাব্বুল মাশরেকাইনে ওয়া রাব্বুল মাগরেবাইন।

(২৫-এর পাতার পর)

অন্তর্গত; আমি আশা করি জামা'ত এই উপদেশ দ্বারা উপকার লাভ করবে, নিজেদের অবস্থার উপর চিন্তাভাবনা করবে, নিজদিগকে পর্যালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাবে। তখন আপনারা নিজেদেরই মধ্য হতে, নিজেদের প্রত্যেক অকৃতকার্যতার মধ্য হতে কৃতকার্যতা অর্জন করবেন। ইহার বিপরীত যদি আপনারা অন্যদিগকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাবার অভ্যেস করেন, অন্যদের মধ্যে দোষত্রুটি অন্বেষণ করেন এবং নিজেদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন যে, আপনাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের দিকে অগ্রসর হবে। তাহলে আপনারা আর খোদার হলেন না এবং হবেনও না। এইরূপ অপরাধীর অবস্থায় কখনো প্রাণ ত্যাগ করবেন না। খোদা করুন আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেককেই এমন অবস্থায় যেন প্রাণ ত্যাগ করে যখন তার উপর رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ আয়াতটি প্রযোজ্য হয়, যখন সে খোদার প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তার প্রতি খোদা সন্তুষ্ট হন। (১১ই জুন, ১৯৯২ইং : সাপ্তাহিক বদরের সৌজন্যে,)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা) —হযরত ইমাম : মাহ্দী (আঃ)

'খতমে নবুওয়ত' প্রসঙ্গে

মাওলানা সালেহ আহমদ

গত ১৩ই আগষ্ট, '৯২ দৈনিক ইনকিলাব এর একটি প্রবন্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে অনেক অসত্য ও বিভ্রান্তিকর কথা বলা হয়েছে। পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংক্রান্ত লেখাটি ছাপিয়ে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা এবং ইসলামী ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন—সংগতভাবেই এই আশা করতে পারি। প্রবন্ধটিতে জেহাদ বিল কুরআন ও সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত খাতামুন্নাবীঈন (সাঃ)-এর উপর পূর্ণ বিশ্বাসী এক শান্তি প্রিয় সম্প্রদায়ের উপর এই অপবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী নয় ও তারা ইংরেজদের দোসর। এখানে সংক্ষেপে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ হতে বক্তব্য পেশ করা হলো:

১। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস রাখে যে, যেহেতু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম খাতামুন্নাবীঈন, তাই তাঁর পর এমন কোন নবীর আবির্ভাব হতে পারে না, যিনি নতুন শরীয়ত নিয়ে আসবেন। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অনেক প্রাচীন সর্বজন স্বীকৃত বুযূর্গানও এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ), শেখ মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী, মুজাদ্দেদ আলফেসানী, সৈয়দ অলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী প্রমুখ (রহঃ)।

২। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস করে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্-তা'লা তাঁর উম্মতের ভবিষ্যতের সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়েও বেশী মতভেদের সৃষ্টি হবে এবং তারা অনেক দলে বিভক্ত হবে। অন্যান্য মুসলমানদেরও ইহাই বিশ্বাস (দেখুন তিরমিযী, মুসলিম)।

৩। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বাস উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মতভেদ ও দূরবস্থার যুগে এই উম্মতকে একত্রিত করার জন্যে ও তাদের সংস্কারের জন্যে হযরত রসূল করীম (সাঃ) এক মহাপুরুষের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, যাঁকে খোদাতা'লা মনোনীত করবেন। আহমদী ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদেরও বিশ্বাস এরূপই। যেমন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ), মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ), মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব, হযরত মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) আরও অনেকে।

৪। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বাস এই যে, সেই মহাপুরুষের আগমন হবে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংস্কার ও একত্রীকরণের জন্যে। তিনি নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসবেন না বরং হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর অধীনস্থ হয়ে আসবেন ও তাঁর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আহমদী ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের বিশ্বাস এইরূপই।

৫। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই বিশ্বাস রাখে যে, যেই ব্যক্তি এই উম্মতের

সংস্কারের জন্য আসবেন, তিনি হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর আনুগত্য ও কল্যাণে, তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী, হযরত ঈসা নবী সদৃশ হয়ে ইমাম মাহদী রূপে আগমন করবেন। হাদীসে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যেমন: (ক) লা মাহদী ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়াম (ইবনে মাজা, বাবু সিদ্দাতুয্ যামান) অর্থাৎ মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেহ নহেন। (খ) কায়ফা আনতুম ইযা নাযালা ইবনে মারয়ামা ফীকুম ফা আম্মাকুম (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান) অর্থাৎ তোমাদের অবস্থা তখন কেমন হবে, যখন ইব্নে মরিয়ম তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তোমাদের ইমামতি করবেন। (গ) ইউশেকু মান আশা মিনকুম আন্ ইয়াল্কা ঈসাব্না মারয়ামা ইমামান্ মাহ্দীয়ান হাকামান আদালান (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা দেখতে পাবে ঈসা ইব্নে মরিয়মকে ন্যায়পরায়ণ মীমাংসাকারী ইমাম মাহদী রূপে।

৬। অপরদিকে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংস্কারের জন্য দুই পৃথক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, একজন উম্মত থেকে হবেন, যাকে খোদাতা'লা ইমাম মাহদী রূপে দণ্ডায়মান করবেন। তাঁর সাথে আর একজন নবীও পুনরাগমন করবেন, যিনি খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক হযরত ঈসা (আঃ); আর তিনি আকাশ হতে অবতরণ করবেন।

সুতরাং দেখা যায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত খাতামুন্নবীঈন (সাঃ)-এর পর শুধু একজন মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনে বিশ্বাসী কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধবাদী উলামা খাতামুন্নবীঈন (সাঃ)-এর পর দুই জন মহামানবের আগমনে বিশ্বাসী, একজন ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও অপরজন হযরত ঈসা (আঃ)।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও এর বিরুদ্ধবাদীগণ সমভাবে বিশ্বাস করেন যে, (ক) হযরত রসূল করীম (সাঃ) খাতামুন্-নবীঈন (খ) হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পর কোন শরীয়তধারী নবীর আগমন হবে না। (গ) হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পর হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর উম্মতের সংশোধন ও একত্রীকরণের জন্য যিনি আসবেন তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকেই হবেন ও তিনি হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) হবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধবাদীগণ ইহাও বিশ্বাস করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পর এমন এক ব্যক্তি আসবেন যিনি কিতাবধারী নবী ছিলেন এবং নবী রূপেই উম্মতে মুহাম্মদীয়া মধ্যে আসবেন, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্বাস হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ)-এর পর হযরত ঈসা (আঃ) আসতে পারেন না। প্রথম কারণ এই যে, কুরআন করীম, হাদীসে নব্বী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক সাক্ষীসমূহ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশে উত্থিত হন নি

বরং ক্রুশের ঘটনার পরে স্বাভাবিক জীবন যাপনের পর মৃত্যুবরণ করেছেন। এবং যিনি একবার মৃত্যু বরণ করেন, তিনি আর এই পৃথিবীতে আসতে পারেন না। দ্বিতীয় কারণ হল, যিনি খৃষ্টধর্মের নবী ছিলেন, তাঁর পুনরাগমনে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) শেষ নবী বলে গণ্য হতে পারেন না। তাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয়।

উপরোক্ত বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উপর এই অপবাদ দেয়া যে, তারা খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসী নয়, এই জামা'তের প্রতি একটা বড় অবিচার। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত যদি এই বিশ্বাস করে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পর এক মহাপুরুষ তাঁর উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন, তাহলে তারা খতমে নবুওয়তে অবিশ্বাসী হয়। অথচ যারা নিজেরাই হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর পর দুই ব্যক্তির আগমনে বিশ্বাসী হন, যার মধ্যে একজন পূর্বতন স্বতন্ত্রভাবে মনোনীত নবী, তারা খতমে নবুওয়তে বিশ্বাসীই থেকে যান। পৃথিবী থেকে কি বিবেক বুদ্ধি, ইনসাফ একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে? খোদার ওয়াস্তে চিন্তা করুন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত খোদার ফযলে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে নিঃসন্দেহে খাতামুন্‌নবীঈন বলে মানে।

আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্যে যে নবীর আগমন হতে পারে তা সূরা নিসার ৭০ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আয়াতটির বাংলা তরজমা হলো: এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ ও সালেহগণের মধ্যে; ইহারাই সাক্ষী হিসেবে উত্তম।

আজ বাংলাদেশের তথাকথিত আলেমদের একটি দল পাকিস্তানের পদ্ধতিতে আমাদের এ দেশে সেখানকার তথাকথিত ইসলাম প্রবর্তনের চেষ্টায় লিপ্ত আছে। এ ব্যাপারে নতুন দিল্লীতে সৌদী আরব দ্বারা পরিচালিত ইসলামিক সেন্টারের মহাপরিচালক জনাব ওহী উদ্দীন সাহেবের লিখিত প্রবন্ধের একটি অংশ প্রনিধাণযোগ্য। তিনি লিখেন:

"আশ্চর্যের ব্যাপার পাকিস্তানে অসংখ্য ইসলামী জামাত ও সংগঠন রয়েছে। কিন্তু কোন জামাত অথবা সংগঠন নাই যাদের পরিকল্পনায় সেখানকার অমুসলিমদের নিকট ইসলাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা রয়েছে। পাকিস্তানে হিন্দু ও খৃষ্টান জনসংখ্যার দিক হতে একটি ভালো সংখ্যায় আছে। অপর দিকে মুসলমানদের অবস্থা এই যে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার জন্যে তারা বহু হাঙ্গামা করেছে কিন্তু অমুসলিমদের ইসলামের রহমতে প্রবেশ করানোর কোন প্রয়াস পাকিস্তানে এখনও চালিত হয় নি। যদিও খৃষ্টানগণ সেখানে জোর তবলিগী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থাও

অনুরূপ। তারা লোকদিগকে জাহান্নামে পৌঁছাতে অত্যন্ত ব্যাকুল কিন্তু মানুষকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছানোর কোন ব্যাথাই নাই"। (আর রিসালা পৃঃ ৩৭, ১৯৮৫)

সুধী সমাজ ভেবে দেখবেন কি যে, আজ আমাদের দেশের তথাকথিত উলামাদের অবস্থা তাই নয় কি? জনাব জসীমউদ্দীন খান পাঠান সাহেব তার লেখাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে ইংরেজদের দোসর বলে অপবাদ দিয়েছেন। জালিয়াতীর কত বড়ইনা ধৃষ্টতা যে উদোর পেণ্ডি বুধোর ঘারে। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ অনুসৃত উলামাদের কথা ভুলে গেলেন। জনাব মাওলানা নজীর আহমদ দেহলবী লিখেন "আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানী ইংরেজরা এদেশের রাজা হয়েছে" (দেখুন বক্তৃতামালা মাওলানা নজীর আহমদ দেহলবী, পৃঃ ৪৫)। মাওলানা মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী লিখেন "এই শান্তি ও স্বাধীনতা এবং সুশাসনের দিক দিয়ে ভারতবর্ষের আহলে হাদীস সম্প্রদায় বৃটিশ সরকারকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গনিমত মনে করে এবং এই সরকারের প্রজা হওয়াকে মুসলমান সুলতানদের প্রজা হওয়ার চাইতে উত্তম মনে করে" (ইশায়াতুস সুন্নাহ, ১০ম সংখ্যা, ২৯২-২৯৩পৃঃ)।

একটি কুরআনের আয়াতের দিকে জনাব পাঠান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনুগ্রহ করে বলবেন কি ইংরেজের দোসর কে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে তুমি তাহাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদিগকে এবং যাহারা শিরক করিয়াছে তাহাদিগকে লোকের মধ্যে কঠোর দেখিতে পাইবে" (সূরা মায়েদা : ৮২) অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টান যারা খোদার পুত্র বানিয়ে শিরক করেছে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কঠোর। আল্লাহতা'লা আরও বলেন, "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে সে নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে (গণ্য) হইবে।" (সূরা মায়েদা : ৫১)

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে যারা আমেরিকার ভূমিকাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং ফতওয়া দিয়েছিলেন কুরআন শরীফ তাদের কি আখ্যা দিয়েছে ভেবে দেখুন। আল্লাহ্‌ তা'লা কাকে ইংরেজদের অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারার দোসর বলেছেন। আল্লাহ্‌ তা'লা সকলকে হেদায়াত দিন।

Ahmadiyyat কে ব্যাখ্যা করলে যা হয়

A—Affectionate—স্নেহশীল
H—Humanity—মনুষত্ব/Honesty—সততা
M—Magnanimity—উদারতা/Mortification—সংযম রিপুদমন
A—Affable—অমায়িক/Activity—সক্রিয়তা।
D—Discipline—নিয়মানুবর্তিতা/Dutiful—কর্তব্যপরায়ণ
I—Intelligent—বুদ্ধিমান
Y—Yeild—ত্যাগ করা
Y—Youth—তারুণ্য
A—Adviser—পরমর্শদাতা/Alert—চটপটে/সতর্ক
T—Truthfull—সত্যবাদী/Timely—সময়োপযোগী

আফজালুর রহমান (রিপন)
ক্রোড়া জামাত,

[সম্প্রতি ওকালতে ওয়াক্‌ফে নও, তাহরীকে জাদীদ থেকে ওয়াকেফীনে নও শিশুদের অভিভাবকদের জন্যে একটি পাঠ্যসূচী পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হচ্ছে—অনুবাদক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান।]

(৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পরে)

তিন থেকে চার বছরের শিশুদের জন্য

জানুয়ারী ঃ শিখান যে, কুরআন শরীফ আল্লাহ্‌র কেতাব বা গ্রন্থ। তাদেরকে ইয়াস্‌ সারনাল কুরআন পড়ান শুরু করুন। তাদেরকে প্রারম্ভিক দোয়াটি পাঠ করতে বলুন :

আউযু বিল্লাহে মিনাশ্‌ শাইত্বানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম (অর্থ : আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।)

ফেব্রুয়ারী ঃ আরবী বর্ণমালার সাথে তাকে পরিচয় করান।

মার্চ্চ ঃ খাবার পূর্বের এ দোয়াটি শিখান :

বিসমিল্লাহে ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ্‌

এপ্রিল ঃ খাবার শেষ করলে শিশুকে নিম্নের দোয়াটি শিক্ষা দিন :

আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী ওয়া আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়াজআলনা মিনাল মুসলেমীন।

মে ঃ মহানবী (সাঃ)-এর খলীফাগণের নাম শিক্ষা দিন : হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), [টিকা : খলীফাগণের নাম পাঠের পর রাযিয়াল্লাহুতা'লা আনহু (আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) পড়তে হয়]

জুন ঃ শিক্ষা দিন যে, মসীহ্‌ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক)-এর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, আলায়হেস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম।

জুলাই ঃ আমাদের চতুর্থ খলীফা হলেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইয়াদাহুল্লাহুতা'লা বেনাস্‌রেহিল আযীয অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'লা নিজ সাহায্য দ্বারা তাকে সামর্থ্যশালী করুন)।

আগষ্ট ঃ আরও দুই খলীফার নাম মুখস্ত করতে সাহায্য করুন—হযরত আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রাঃ) ও হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)।

সেপ্টেম্বর ঃ আরও দুই খলীফার নাম মুখস্ত করতে সাহায্য করুন—হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহঃ) ও হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)।

অক্টোবর ঃ প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এবং তাঁর চার খলীফার ছবির সাথে শিশুদের পরিচয় করাতে থাকুন।

নভেম্বর ও ডিসেম্বর ঃ যে ঐশী সত্তা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সম্বন্ধে তাকে বলুন আর এই বর্ণনা সাথে সাথে তাকে মনোরম চাঁদ যা আকাশে কিরণ দেয় এবং ঐ তারকারাজি যা মিট মিট করে জ্বলে ওগুলোও আল্লাহ্‌তা'লা সৃষ্টি করেছেন। তদনুরূপ আম কলা যা সে খায় তাও তাঁরই সৃষ্টি।

এগুলো আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন আর এগুলো আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন কেননা তিনি আমাদেরকে অনেক অনেক ভালবাসেন।

এসব সাধারণ সাধারণ অথচ মৌলিক জিনিষ সম্বন্ধে তাকে ধারণা দিন যাতে তার অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয় আর সে ধীরে ধীরে বুদ্ধিমত্তার প্রবৃদ্ধিতে ধাপে ধাপে উঠতে থাকে। শিশুর প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দেবার চেষ্টা করুন।

টীকা : এ বছর শিশুর ইয়াস্‌সারনাল কুরআন এর প্রথম অংশের পাঠ শেষ হওয়া জরুরী।

চার থেকে পাঁচ বছরের শিশুর জন্যে ঃ

এ বছরে ইয়াস্‌সারনাল কুরআনের পাঠ সম্পূর্ণ হওয়া জরুরী।

নামাযের দোয়া দরূদগুলোও এ বছরে মুখস্ত করানো দরকার।

জানুয়ারী ঃ নামাযের নাম ও সময়সূচী সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করা দরকার।

ফেব্রুয়ারী ঃ ঘুমুতে যাওয়ার পূর্বে নিম্নের দোয়াটি যেন শিশু পাঠ করে, মুখস্ত করে এবং রীতিমত পড়ার অভ্যেস করে :

আল্লাহুম্মা বেস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া (হে আল্লাহ্‌! তোমার নামে মারা যাই ও জীবিত হই।)

মার্চ্চ ঃ ঘুম থেকে উঠে নিম্নের নির্ধারিত দোয়াটি যেন শিশু পাঠ করে, মুখস্ত করে এবং রীতিমত পড়ার অভ্যেস করে :

আল্‌-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হেন্‌-নুশুর (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন আর তাঁর দিকেই পুনরুত্থান হবে।)

এপ্রিল ঃ শিশুকে প্রত্যহ দাঁত মাজার অভ্যেস সৃষ্টি করুন এবং হালকা ধরণের ব্যায়ামের প্রশিক্ষণ দিন।

মেঃ এ নজমটি মুখস্ত করান :

কভী নুসরৎ নেহী মিলতি দারে মাওলা সে গান্দুঁ কো
কভী যায়া নেহী করতা ওহ্ আপ্‌নে নেক বান্দুঁ কো
ওহী উস কে মোকার্‌রব হ্যাঁয় জো আপনা আপ খোতে হ্যাঁয়
নেহী রাহ্ উসকী আলী বারগাহ্ তক্ খোদ পসন্দুঁ কো
এহি তদবীর হ্যায় পেয়ারু কেহ্ মাঙ্গো উস সে কুরবত কো
উসী কে হাথ কো ঢোণ্ডো জ্বালাও সব কুমান্দোঁ কো [হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)]

অর্থাৎ : অসৎ লোকদের কখনও প্রভুর দরজায় সাহায্য মেলে না। নিজ পুণ্যবান দাসদের তিনি কখনও নষ্ট করেন না। তারাই তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত যারা নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়। তাঁর উচ্চ দরবারে অহংকারীদের কোন রাস্তা নেই। হে প্রিয়গণ! ইহাই উপায় যে, তাঁর নিকট থেকে তাঁর নৈকট্য প্রার্থনা করো। তাঁর (সাহায্যের) হাত অন্বেষণ করো, সকল সোপান জ্বালিয়ে দাও।

জুনঃ এই হাদীসটি শিক্ষা দিন :

খায়রুয্ যাদিত্তাক্ওয়া [তাক্ওয়া (খোদা-ভীরুতা)ই উত্তম পথের সম্বল]।

জুলাই থেকে অক্টোবরঃ প্রত্যেক মাসে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত 'তারানা আতফাল' (শিশুদের সংগীত)-এর ৩ স্তবক মুখস্ত করান এবং অক্টোবর মাসে ২টি স্তবক মুখস্ত করান। (এ পুস্তিকার শেষে তারানা আতফাল দেয়া হয়েছে)

নভেম্বরঃ নিম্নোক্ত হাদীসটি শিক্ষা দিন :

আল্ গিনা গিনান্ নাফসী (প্রকৃত সম্পদ ও সমৃদ্ধি হলো হৃদয়ের সম্পদ ও সমৃদ্ধি)।

ডিসেম্বরঃ নিম্নোক্ত হাদীসটি শিক্ষা দিন :

ইন্নামাল 'আমালু বিন্নিয়াত (নিশ্চয় কাজের গুণাগুণ নিয়্যত বা সংকল্পের ওপর নির্ভরশীল)

পাঁচ এবং ছয় বছরের শিশুদের জন্যে :

এ বছরের মধ্যে শিশুকে কুরআন মজীদের প্রথম ও শেষ পারার নাযেরা (দেখে দেখে) পাঠ শিক্ষা করা উচিত। প্রত্যেক মাসে পিতামাতার সাথে শিশুরও হুযুর (আইঃ)-এর নিকট নিজ হাতে পত্র লেখা উচিৎ তা দু' এক লাইনই হোক না কেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় পিতার উচিৎ তিনি যেন শিশুকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যান। শিশুকে তার পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে ও অবহিত করতে হবে।

জানুয়ারীঃ শিশুকে তার পিতা মাতার জন্যে নিম্নোক্ত দোয়া করতে শিখাতে হবে :

রাব্বির্ হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা [হে আমার প্রভু! তাদের (পিতা মাতার) উভয়ের প্রতি করুণা করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে (করুণা ভরে) প্রতিপালন করেছেন]।

ফেব্রুয়ারীঃ 'আযান' স্মরণ করান। বাচ্চাকে প্রত্যহ রেডিও ও টিভিতে প্রদত্ত আযান শ্রবণ করান।

মার্চ্চ ঃ শিশুকে মসজিদে প্রবেশ করার নিম্নোক্ত দোয়া শিখান আর সে যেন মসজিদে প্রবেশ করার সময়ে এই দোয়া পাঠ করে ঃ

আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতিকা (হে আমার আল্লাহ! আমার জন্যে তোমার করুণার দরওয়াজাসমূহ খুলে দাও।)

এপ্রিল ঃ মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া শিখান আর শিশু যেন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ে এ দোয়া পাঠ করে ঃ

আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা ফাযলিকা (হে আমার আল্লাহ্‌! আমার জন্যে তোমার কল্যাণের দরওয়াজাসমূহ খুলে দাও)

মে ঃ এ দোয়াটি শিখান ঃ

রাব্বি যিদ্‌নী ইলমান (হে আমার প্রভু! আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দাও)।

জুন ঃ শিখান যে, আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরবের মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতার নাম হযরত আবদুল্লাহ ও মাতার হযরত আমেনা।

জুলাই ঃ শিখান যে, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়া সাল্লামের পিতার নাম হযরত গোলাম মর্তুযা ও মাতার নাম হযরত চিরাগ বিবি। তিনি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

আগষ্ট ঃ সূরা আল্‌ কাওসার মুখস্ত করান।

সেপ্টেম্বর ও সূরা আল্‌ ফাতেহার অর্থ শিক্ষা দিন। সাথে সাথে ঘরের তিনটি জিনিস

অক্টোবর ঃ আবিস্কারকের নাম শিক্ষা দিন যেমন, (১) ক্যামেরা আবিস্কার করেন ফক্স টালবোট, (২) টেলিভিশন আবিস্কার করেন জন লুই জিবেয়ার্ড (৩) রেডিও আবিস্কার করেন মার্কোনী।

নভেম্বর ঃ সূরা আল্‌ আসর মুখস্ত করান।

ডিসেম্বর ঃ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত নজমটি মুখস্ত করান ঃ

হো ফযল তেরা ইয়া রব্ব্‌ কোই ইবতেলা হো
রাযী হ্যাঁয় হাম উসীমে জিস্‌ মে তেরী রেযা হো
মিট যাঁউ ম্যাঁয় তো উসকী পরওয়াহ্‌ নেহী হ্যাঁয় কুছভী
মেরী ফানা সে হাসেল গর দিনকো বাকা হো
সীনে মেঁ জোশে গায়রত আওর আঁখ মে হায়া হো
লাব পর হো যিক্‌র তেরা দিল মে তেরী ওফা হো
শায়তান কি হুকুমাত মিট জায়ে ইস জাহাঁ সে

হাবিম তামাম দুনিয়া পে মেরা মুস্তাফা হো
মাহ্মুদ উম্র মেরী কাট জায়ে কাশ হুঁহি
হো রূহ মেরী সেজদাহ্ মে সামনে খোদা হো

[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)]

অর্থ : হে প্রভু ! তোমার কল্যাণ বর্ষিত হোক বা কোন পরীক্ষা আসুক,
আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যাতে তোমার সন্তুষ্টি।
ধ্বংস হয়ে যাই আমি তাতে কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই,
যদি আমার বিলীন হওয়াতে ধর্ম জীবিত হয়।
অন্তরে থাকুক মোর আত্মমর্যদার আবেগ আর চোখে লজ্জা,
ঠোঁটে থাকুক তোমার গুণগান আর অন্তরে থাকুক বিশ্বস্ততা।
এ ধরা থেকে শয়তানের কর্তৃত্ব মিটে যাক,
সারা দুনিয়ার কর্তা হোক আমার মুস্তফা (সাঃ)।
হে মাহমুদ ! আমার আয়ু যদি এভাবেই কেটে যায় যাক,
আত্মা মোর সেজদাতে আর সামনে খোদা থাকুন।

তারানা আতফাল

(শিশুদের সংগীত)

মেরি রাত দিন বাস এহী এক সদা হ্যায়
কেহ্ ইস আলমে কাওন কা এক খোদা হ্যায়
উসীনে হ্যায় পয়দা কেয়া ইস্ জাহাঁ কো
সাতারোঁ কো সুরাজ কো আওর আসমাঁ কো
ওহ্ হ্যায় এক উসকা নেহী কোই হামসর
ওহ্ মালেক হ্যায় সবকা ওহ্ হাকেম হ্যায় সব পর
নাহ্ হ্যায় বাপ উসকা নাহ্ হ্যায় কোই বেটা
হামেশাহ্ সে হ্যায় আওর হামেশাহ্ রাহেগা
হার এক চিজ পর উসকা কুদরত হ্যায় হাসেল
হার এক কাম কি উসকো তাকত হ্যায় হাসেল
পাহাড়োঁ কো উস নে হী উঁচা কেয়া হ্যায়
সমন্দর কো উস নে হী পানি দিয়া হ্যায়
ইয়েহ্ দরিয়া জো চারোঁ তরফ বহ্ রাহে হ্যায়
উসীনে তো কুদরত সে পয়দা কিয়ে হ্যায়
সমন্দর কি মাছলি হাওয়া কে পরেন্দে
ঘরেলু চরেন্দে বনোঁকে দরেন্দে

হার এক শায়ে কো রোযি ওহ্‌ দেতা হ্যায় হরদম
খাযানে কভী উস কে হোতে নেহী কম
হ্যায় ফরিয়াদ মযলুম কি সুনলেওয়ালা
সাদাকাত কা করতা হ্যায় ওহ্‌ বোল বালা
এহী রাত দিন আব তো মেরী সদা হ্যায়
ইয়েহ্‌ মেরা খোদা হ্যায়—ইয়েহ্‌ মেরা খোদা হ্যায়,

[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আল্‌ মুসলেহ মাওউদ ও খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ)]

অর্থ : রাতদিন আমার ঐ একই আওয়াজ
যে, এ বিশ্ব জগতের একজন খোদা আছেন।
তিনিই সৃষ্টি করেছেন এ পৃথিবীকে,
তারকারাজীকে, সূর্যকে আর আকাশকে।
তিনি এক-অদ্বিতীয়, নাই তাঁর কোন সংগী
তিনি কর্তা, সবার উপরে তিনিই শাসক।
নাই তাঁর কোন পিতা, নাই কোন পুত্র।
সর্বদাই আছেন আর সর্বদাই থাকবেন।
প্রত্যেক বস্তুর ওপর তাঁর শক্তি ও মহিমা বিরাজমান,
প্রত্যেক কাজের শক্তির অধিকারী তিনিই।
পাহাড়গুলোকে তিনিই উচ্চ করেছেন,
সমুদ্রকে তিনিই পানি দান করেছেন।
এই যে নদী যা চারদিকে বয়ে চলেছে,
তিনিই তো স্বীয় শক্তি ও মহিমায় সৃষ্টি করেছেন।
সমুদ্রের মাছ, বাতাসে উড়ন্ত পাখী
গৃহের পশু, বনের পশু,
প্রত্যেক জিনিসকে সর্বদা তিনি রিয্‌ক (জীবিকা) দিচ্ছেন,
তাঁর ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না।
নির্যাতনের সব ফরিয়াদ তিনি শোনেন,
সত্যের বাণীকে তিনি সমুন্নত করেন।
ইহাই রাতদিন এখন আমার আওয়াজ,
এই আমার খোদা—এই আমার খোদা

সংবাদ

বিভিন্ন জামা'তে সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর জলসা অনুষ্ঠিত

মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ মারহাবা ইয়া নাবীআল্লাহ্

নিম্নলিখিত জামা'তগুলোতে অতি শান ও শওকাতের সাথে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর পবিত্র সীরাতের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জামা'তের লোকজন ছাড়াও অ-আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ যোগদান করেছিলেন। দেরীতে খবর পাওয়ায় আর স্থান সংকুলান না হওয়ার বিস্তারিত খবর দেয়া সম্ভবপর হল না বলে দুঃখিত:

চুয়াডাঙ্গা, কাফুরিয়া, সুন্দরবন, চরসিন্দুর, হেলেঞ্চাকুড়ি, ভাতগাঁও, নিউ সোনাতলা, ময়মনসিংহ, উত্তর বাহেরচর, চরদুঃখিয়া, নাসেরাবাদ, বিষ্ণুপুর, মহারাজপুর ও তেরগাতী।

আহমদী বার্তা

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বাণী

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ২১তম ইজতেমা উপলক্ষ্যে কিছু বলার জন্য 'আহ্বান' পত্রিকায় কর্তৃপক্ষ আহ্বান জানিয়েছে। তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে খুবই উৎসাহিত ও আনন্দ বোধ করছি এবং তাদের ইজতেমার সামগ্রিক সাফল্য কামনা করছি। এখানে মূল কথা হলো, এ সাফল্যের অর্থ ও তাৎপর্য গভীরভাবে উপলব্ধি করে লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা চালানো। দুনিয়াতে আগত সকল নবী রসূলের লক্ষ্যই ছিল মানুষকে মোমেন মুত্তাকীরূপে গড়ে তোলা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মারফত আল্লাহ এই রূপকে পূর্ণতা ও বিশ্বরূপ দান করেন। তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ ঐ রূপের 'প্রদর্শন' (Demonstration) করে গেছেন। ঐ প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য এ যুগের মানুষ তো চৌদ্দশত বছর পেছনে যেতে পারে না। তেমনি পারা যাবে না তখনকার মোমেন মুত্তাকীগণকে এ যামানার সামনে হাযির করা। এতে যে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করার মহান দায়িত্ব বহন করতে হবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য সদস্যাগণকে। হযরত ইমাম মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত কুরআন পাকের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশে ঐ পথের নির্ভুল সন্ধান দিয়েছেন। তাই দুনিয়ার সামনে আমাদের জীবনকে মুমেন মোত্তাকীরূপে পেশ করার যোগ্যতা অর্জনে সদা তৎপর থাকতে হবে। নতুবা আমাদের ও অন্যদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।

১৩ আশ্বিন, ১৩৯৯ বাংলা
২৮-৯-৯২ইং

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২১তম বার্ষিক সম্মেলন সমাপ্ত

সৎ ও খোদাভীরু মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করুন —মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

দুনিয়াতে যুগে যুগে দেশে দেশে নবী রসূলের আগমনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে সৎ ও খোদাভীরু মানুষ সৃষ্টি করা। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহতা'লা এই লক্ষ্যের চরম বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতা দান করেছেন। মহানবীর সাহাবগণ সেই আদর্শের ফসল।

গত শুক্রবার ৯ই অক্টোবর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের তিন দিন ব্যাপী একবিংশ বার্ষিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

গত ৭ই অক্টোবর সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, জাতীয় ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, মুসলিম বিশ্বের শান্তি, কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য দোয়া। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বাণী পাঠ, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ, চরিত্র গঠনমূলক বক্তৃতা, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ভিডিও কেসেট প্রদর্শনী, ধর্মীয় জ্ঞানের আলোচনা পর্যালোচনা, আগামী বছরের কর্মসূচী প্রণয়ন, তফসীরে কুরআন, ইসলামের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের শপথ পাঠ এবং খেলাধুলাসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা।

তিনদিন ব্যাপী ৬টি অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মেজর জেনারেল (অবঃ) আমজাদ আহমদ খান চৌধুরী, তাসাদ্দক হোসেন, আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী, মোহাম্মদ মুতিউর রহমান (নানাভাই), মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সেলিম খান, ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি সম্পাদক মোঃ নাসির উদ্দিন।

সভাপতির ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী বলেন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও মানব সেবায় কর্তব্য নিষ্ঠা, দক্ষতা ও নৈপুন্যে এই মজলিস নব দিগন্তের উন্মোচন করেছে। সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত এই মজলিসের সদস্যরা ইসলাম ও মানব সেবায় নিয়োজিত থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুস্থ মানবতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রসারিত করেছেন সেবার দরদী হাত। সেবা আর ভালবাসার মাধ্যমে মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ ভিত্তিক একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের অবিরাম প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ লক্ষ্যে আমরা আমাদের মান-সম্মান, ধন-সম্পদ আর জীবনকে তুচ্ছ করে বিরামহীনভাবে এগিয়ে যাবো।

অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সংগঠনের মাসিক পত্রিকা 'আহ্বান'-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

জাফর আহমদ প্রধান
মোহতামীম ইশায়াত

বিশেষ দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কানাডা বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নায়েব আমীর (৩) আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরীকে উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ মসজিদের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কানাডীয় দূতাবাস এজন্য ভিসাও প্রদান করেছে। আগামী ১৭ই অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এই মসজিদের উদ্বোধন করবেন, ইনশাল্লাহ। জনাব চৌধুরী সাহেব এই সফরে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি জামা'তও পরিদর্শন করতে পারেন।

তিনি যাতে এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন সেজন্য সকলে কাছে খাস দোয়া প্রার্থী।

আহমদী বার্তা

দোয়ার এলান

আমার আব্বা মৌঃ নাজাত উল্লাহ আহমদ প্রধান, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ (অবঃ) এবং আমার ভগ্নীপতি মৌঃ ইয়াছিন নূরী মাষ্টার (বীরগঞ্জ) উভয়েই দীর্ঘদিন যাবৎ হৃদ

রোগে ভুগছেন। কিছু দিন পূর্ব হতে আমার আব্বার পা ও পেটে কিছু পানির ভাব দেখা যাচ্ছে। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর জামা'তের মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ হিসাবে খেদমত করে বর্তমানে অবসর যাপন করছেন।

তাঁদের উভয়ের আশু রোগ মুক্তির জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

রফিক আহমদ প্রধান
ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আমার ছেলে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (শাহিন) রাজশাহী বোর্ডে ১৯৯২ সালের এস, এস, সি, পরীক্ষায় ৪টি বিষয়ে লেটার সহ বিজ্ঞান বিভাগে মোট ৮২৯ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে এখন রাজশাহী বিভাগীয় সরকারী কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক। তার ভর্তি পরীক্ষা গত ১০/১০/৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমার ছেলের এস, এস, সি, পরীক্ষার কৃতীত্ব এবং তার রাজশাহী বিভাগীয় সরকারী কলেজের ভর্তির জন্য সমগ্র দেশের আহমদী ভাই ও বোনেরা যাতে দোয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য উক্ত বিষয় পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মোঃ সাজ্জাদার রহমান মণ্ডল
প্রেসিডেন্ট আঃ মুঃ জাঃ তাহেরাবাদ

শুভ বিবাহ

গত ২২শে সেপ্টেম্বর/৯২ রোজ শনিবার বাদ মাগরেব দারুত তবলীগ মসজিদে আঃ মুঃ জাঃ বাঃ এর মোয়াল্লেম এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম (মাসুদ) এর বিয়ে আহমদনগর নিবাসী প্রাক্তন মোয়াল্লেম মৌঃ নাজাত উল্লাহ আহমদ প্রধান সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা শাহনাজ পারভীন বাবলীর সাথে ২৫০০১/ (পঁচিশ হাজার এক টাকা) দেন মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত বিয়ের এলান করেন সদর মুরব্বী মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব এবং দোয়া করান মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। এ বিয়ে যাতে বরকতময় হয় তার জন্য সবার কাছে দোয়ার দরখাস্ত রইল।

আহমদী বার্তা

শোক সংবাদ

১৫/৯/৯২ইং জি, এম, সিরাজুদ্দিন সাহেব প্রথম কন্যা সন্তান লাভ করেন। সে ৭২ ঘন্টা পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো যায় নি। ফলে সে ১৭/৯/৯২ রাত ১২-১৫ মিঃ ইন্তেকাল করে (ইন্না·····রাজেউন)। রাজশাহী জামা'তের সদস্যগণের উপস্থিতিতে শুক্রবার ৯-৩০ মিঃ নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জামা'তের সকলের নিকট শোক সন্তপ্ত পরিবারের ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করার জন্য দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহারাজপুর নাটোর-এর জনাব মোঃ জালাল উদ্দীন সাহেবের ছোট মেয়ে মোসাম্মৎ রিতা, বয়স আড়াই বৎসর গত ২২/৯/৯২ইং তারিখে দুপুরে সবার অজান্তে হঠাৎ বাড়ীর নিকটবর্তী পুকুরে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে (ইন্না·····রাজেউন)। এতে গ্রামে এক শোক ছায়া নেমে আসে।

জামা'তের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে যেন আল্লাহ্ তা'লা শোক সন্তপ্ত পরিবারকে এ ব্যথা সহ্য করার তৌফীক দান করেন।

শহীদ হোসেন খান

সম্পাদকীয়ঃ

আতফাল দিবস

কোন বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্যে দিবস পালনের রীতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আজকাল বেশ প্রচলিত। আমাদের ন্যাশনাল আমীর সাহেব বাংলাদেশের আতফালুল আহমদীয়াকে গুরুত্ব ও উৎসাহ দেয়ার জন্যে গত ৯ই অক্টোবরকে 'আতফাল দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। নিঃসন্দেহে ইহা এক সময়োচিত পদক্ষেপ। আমাদের আতফাল অর্থাৎ আহমদী কচি কচি শিশুরা আমাদের সম্পদ। এ সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে একে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতঃ এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন আগামী দিনে যখন তাদের স্কন্ধে সমাজের গুরু দায়িত্বভার অর্পিত হবে তখন তারা সহজে এ দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করে।

গত ৯-১০-৯২ তারিখ আতফাল সম্মেলন '৯২ উপলক্ষ্যে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব যথার্থই বলেছেন—আমাদের আতফাল হল থ্রি ইন ওয়ান অর্থাৎ বর্তমানে তারা আতফাল, তাদের মধ্যে খোদ্দাম উঁকি ঝুঁকি মারছে আর আনসার সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর কথায় খোদ্দাম হল 'টু ইন ওয়ান' ও আনসার হলো 'ওয়ান ইন ওয়ান'। কবির সেই সুরই যেন ধ্বনিত হলো ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মুখে—ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে। তিনি আতফালের দায়িত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, যেহেতু বয়সানুক্রমে তাদের ওপর ৩টি দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তাই তাদেরকে সে দায়িত্ব উপলব্ধি করতঃ তা পালনের যোগ্যতা অর্জন করার জন্যে সদা সক্রিয় ও সচেষ্ট থাকতে হবে। শিশুরা অবোধ। তাই তাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্যে সঠিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করার লক্ষ্যে মুখ্যভাবে তাদের অভিভাবকদেরকে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর গৌণভাবে জামাতের দায়িত্ব তো অপরিসীম। এজন্যে নেযামে জামাতের, বিশেষ করে আনসারুল্লাহ, লাজনা ইমাইল্লাহ, খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার কর্মকর্তাগণের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। তারা যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দৃঢ়তার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারী রাখেন তবে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা অবশ্যই সম্ভব হবে।

বর্তমান অবক্ষয়ের স্রোতে সারা বিশ্বের যুব-সমাজ খড়-কুটার মত ভেসে যাচ্ছে। এথেকে যদি আমরা আমাদের যুব-সমাজকে রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখন থেকেই কচি কিশলয়ের মত ছোট ছোট আতফালকে আহমদীয়াত তথা সত্যিকারের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার সাধনায় নেমে পড়তে হবে। এ কাজ করতে পারলে নিঃসন্দেহে আমরা আগামী দিনে অবক্ষয় মুক্ত একটি সমাজ কায়েম করতে সক্ষম হবো। আল্লাহ্ করুন তাই যেন হয়।

সন্তান লাভ

গত ৬/১০/৯২ইং রোজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ক্রোড়াস্থ বাসভবনে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন, আল্ হামদুলিল্লাহ। নবজাতিকার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও জামা'তের একনিষ্ঠ খাদেমা হওয়ার জন্য সকল আহমদীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

স্বপ্নাস্তামান
হেলেঞ্চাকুড়ি

15th October, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীঅত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত্ এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ্ব এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury